বিনুর বই

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার

—কে

ভূমিকা

"আমি প্রবীণদের মহলে নবীন, নবীনদের মহলে প্রবীণ।...নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি পরস্পরকে পরিচিত করাতে পারি। প্রবীণদের বোঝাতে পারি নবীনরা কী ভাবে, যদিও নবীনদের সঙ্গে আমার পরিচয় অপ্রচুর। আর নবীনদের বোঝাতে পারি প্রবীণদের মনোভাব, যদিও প্রবীণদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্বল্প।...আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্তি আছে, আমি চেষ্টা করব নিরসনের। আধুনিকদের কাছে অত্যাধুনিকদের নানা জিজ্ঞাসা আছে, আমি উত্তরদানের চেষ্টা করব। এই দুই কর্তব্য এক সঙ্গে করা হয় যদি অভিভাষণটিকে কাহিনীর আকার দিই।...আমি যার কাহিনী বলতে যাচ্ছি তার নাম দেওয়া যাক বিনু।

প্রায় চার বছর আগে জামসেদপুর প্রবাসীবঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে এই ছিল আমার গৌরচন্দ্রিকা। বিনুর সে কাহিনী পরে "জীবনশিল্পী"র অন্তর্গত হয়েছে। কাহিনীটিকে একটু বড় আকারে লেখবার ইচ্ছা ছিল। এত দিন পরে তার সুযোগ পাওয়া গেল। এটি কিন্তু কাহিনী হলো না। কাহিনী যদি হয়ে থাকে তবে জীবনের নয়, মনের। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।

২রা অক্টোবর ১৯৪৪ অন্নদাশঙ্কর রায়

বিন্দুর বই

আদি অন্ত

জল না পেলে গাছ শুকিয়ে যায়, রস না পেলে মানুষ বিন্দুর জনম অবধি রসের অনাবৃষ্টি হয়নি। বলতে নেই, কিন্তু সত্যি বলতে কি, যা হয়েছে তা অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণেও গাছ মরে। বিন্দুরও মরণ হতো। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনিই যিনি অলক্ষ্য থেকে রসের যোগান দেন। জল যাতে দাঁড়িয়ে না থাকে তার জন্যে কাটতে হয় নালা। রস যাতে নিঃসরণের পথ পায়· তার জন্যে সাধতে হয় সঙ্গীত বা কাব্য, অভিনয় বা নৃত্য, ভাস্কর্য বা চিত্র। বিন্দুকে যিনি রসে অনুমগন করেন তিনিই তার শিরে লিখেছেন কেমন করে কাকে নিবেদন করে রসের উপচয় থেকে উদ্ধার পেতে হয়।

কিন্তু তিনি কী লিখেছেন তা ভালো করে পড়তে তার জীবনের বিশ বছর কাটল। কপালের লেখা তো নিজের চোখে দেখবার জো নেই। দেখতে হয় পরের চোখে। পর হয়তো আপনার চেয়েও আপন। বিন্দুও একদিন একজনের চোখের তারায় দেখতে পেল নিজের কপালের লেখা। তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে সে কবি। আগে সন্দেহ ছিল। সন্দেহ

ছিল বলেই তার আগেকার রচনা তাকে তার পথের সন্ধান দেয়নি। সে সব যেন তার সাধন নয়, প্রসাধন।

তা হলেও তার প্রথম বিশ বছর তার সাধনার সামিল, যেমন যুদ্ধের সামিল তার উদ্‌যোগ। কতকটা তার অজ্ঞান্‌তে, কতকটা স্বপ্নের ঘোরে, কতকটা আর পাঁচজনের অনুকরণে, কতকটা সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে তার সাধনার কয়েকটি সোপান সে অতিক্রম করে এসেছিল। এমন কি তার ভুলগুলোও তাকে সাহায্য করেছিল, যেন ভুল নয়, সুবুদ্ধি।

সাধনার শেষ কথা মোক্ষ। বিন্নুর সাধনা রস মোক্ষণের, তাই তার অন্তিম সোপান রসমোক্ষ। কবে সেখানে পৌঁছবে, আদৌ পৌঁছবে কি না কেমন করে জানবে! কিন্তু সেই তার পথ, নান্যঃ পন্থাঃ। পরবর্ত্তী বয়সে আবার সে সংশয়ে পড়েছে, আলো হারিয়েছে, আলেয়ার দিকে চলেছে, কিন্তু মার্গভ্রষ্ট হয়নি, ঘুরে ফিরে মার্গস্থ হয়েছে।

ছেলেবেলায়

বিন্নুর একটা সুবিধা ছিল, তার সমবয়সীদের ছিল না। বিন্নুর ছিল সাত খুন মাফ। রাত্রে আর সবাই পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু বিন্নু তার ঠাকুমাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনায়, কিম্বা বেরিয়ে যায় কীর্ত্তনে। দিনের বেলা আর সবাই ক্লাসে হাজির থাকে, কিন্তু বিন্নু কখন এক সময় উঠে গিয়ে কমন রুমে মাসিকপত্র ওল্‌টায়, কিম্বা লাইব্রেরিতে যত অপাঠ্য বই। বাড়ীতেও তার নিজের একটা লাইব্রেরি ছিল, বাবার দেওয়া।

সেখানে বসে নভেল্ নাটক পড়লে কেউ দেখতে যেত না, শুধু তার মা তার হাতে যে-কোনো বই লক্ষ্য করলেই মন্তব্য করতেন, "হুঁ! নভেল পড়া হচ্ছে!" তার বাবা তাও বলতেন না। কিন্তু বিনু তাঁকে বলবার কারণ দিত না, তাঁকে ভয় করত বলে একটু আড়ালে পড়ত ওসব। কেবল একটা জিনিস পড়ত তাঁকে দেখিয়ে শুনিয়ে। সেটা খবরের কাগজ। আর মাসিকপত্র। এই ছিদ্র দিয়েই শখ প্রবেশ করে। বিনুরও সাধ যায় লিখতে। হাতে লেখা মাসিকপত্র চালাতে। যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। প্রায় রচনাই নকল। নকলনবিশী করে তার শিক্ষানবিশী শুরু। এ কাজে যদি কারো উৎসাহ থাকে তবে তার নাম বিনু নয়। তার উৎসাহের আরো অনেক ক্ষেত্র ছিল।

উপরে বলা হয়েছে মাসিকপত্রের ছিদ্র দিয়ে শখ প্রবেশ করে। আর একটা ছিদ্র ছিল। সেটা রাজবাড়ীর থিয়েটার। তার বাবা ছিলেন থিয়েটারের ম্যানেজার, অবৈতনিক। কেন যে তাঁর মতো রাশভারী লোককে ম্যানেজার করা হয়েছিল সে এক রহস্য। বোধ হয় তিনি ম্যানেজ করতে জানতেন বলে। সময়মতো আরম্ভ, সময়ে শেষ, তার পরে ভূরি ভোজন, এ ছিল প্রতি বারের প্রোগ্রাম। কোনো রকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবার পাত্র ছিলেন না তিনি। তারপর তাঁর রসবোধ ছিল অন্তঃসলিল। পাশা খেলাই হোক, লীলাকীর্তনই হোক, তিনি উপস্থিত না থাকলে আসর জমত না। কিন্তু তিনি গাইতে পারতেন না, অভিনয়েও বড় একটা নামতেন না। মাসে

দু'মাসে দু-এক বার থিয়েটার হতো। বিনুও যেত। নাটক দেখে তারও সাধ যেত নাটক লিখতে। লিখে অভিনয় করাতে। তার বয়স্যেরা তার ছাইভস্ম অভিনয় করে তাকে কৃতার্থ করত, কিন্তু তাকে কোনো প্রধান ভূমিকা দিত না। কী আফসোস!

তাগিদ

ধীরে ধীরে বিনুর উৎসাহ নিবে গেল। নিবে গেল মানে ক্ষেত্রান্তরে গেল। আমাদের এই আখ্যায়িকা বিনুর জীবনী নয়, এতে তার প্রাকৃত জীবনের সামান্যই থাকবে। ক্ষেত্রান্তরের কথা অবান্তর।

বিনুর মাসিকপত্র বন্ধ হয়ে গেল, ঘরোয়া থিয়েটারও। কারণ কোনো দিক থেকে তাগিদ ছিল না। না ভিতরের দিক থেকে, না বাইরের দিক থেকে। যে সৃষ্টি করে সে নিজের খেয়ালেই করে, কিন্তু খেয়ালের পিছনে একটা গরজ না থাকলে খেয়ালকে ঠেলা দিতে কেউ থাকে না, ঠেলা না খেলে খেয়াল এক সময় থেমে যায়। গরজটা হয় স্রষ্টার, নয় সৃষ্টিভোক্তার। নয় দু' পক্ষের। যার গরজ সে তাগিদ করবে, তবেই লেখনীর ঝরনা দিয়ে রস ঝরবে। বাঁশির রব দিয়ে রসের মধু ক্ষরবে। তুলির রং দিয়ে রস রূপ ধরবে।

বাইরে থেকে তাগিদ ছিল না। না থাকারই কথা। এগারো-বারো বছরের বালকের রচনা তার সমবয়সী ভিন্ন আর কে চাইবে! সমবয়সীদের নিজেদেরই কত রকম খেয়াল ছিল,

তা ছাড়া ছিল পড়াশোনার চাপ। বিন্নুর মাসিকপত্রে যারা লিখত তারা লিখতে ভুলল, একাই সবটা ভরাতে গিয়ে সে দেখল মিছে খাটুনি, একজনও পড়বে না। থিয়েটারে—ঘরোয়া থিয়েটারে—দেখা গেল, অভিনেতারা যা খুশি আওড়ায়, পতন ও মৃত্যুর পর উঠে দাঁড়ায়, আর এক হাত লড়াই করে ও বাহবা পায়। নাট্যকারকে কেউ কেয়ার করে না, তার নাটকের যে অভিনয় হচ্ছে এই তার সাত পুরুষের ভাগ্যি। তা হলে নাটক লিখে ভারী তো সুখ!

তার চেয়ে বড় কথা ভিতর থেকে তাগিদ ছিল না। খেয়াল বা শখ দু'দণ্ডেই নিবে যায়। তাকে সারা রাত জ্বালিয়ে রাখতে হলে বাইরের উস্কানিও যথেষ্ট নয়, ভিতরে থাকা চাই জ্বালা। লিখতেই হবে এমন কোনো ব্যাকুল ব্যাগ্রতা ছিল না। বোধ হয় তার যথার্থ কারণ, অন্তরে রস যা ছিল তা উপচে পড়বার মতো নয়। রস জমতে জমতে এক সময় ছাপিয়ে পড়ে, তখন বাইরের চাহিদা থাক বা না থাক ভিতর চায় ভারমুক্ত হতে। তখন রসমোক্ষণ না হলে মানুষ বেদনা বোধ করে। তখন যদি তার হাতে লেখনী থাকে সে লিখবেই। মানা দিলেও লিখবে, বাধা দিলেও লিখবে।

কলাবিদ্যা

লিখবেই, না লিখে মুক্তি নেই। কিন্তু লিখলেও মুক্তি নেই, যদি না জানে কেমন করে লিখতে হয়। তার জন্যে শিখতে

হয় কলাবিদ্যা। এ শিক্ষা একদিনের নয়, এক জীবনের। যার এ শিক্ষা হয়নি তার রসোদ্‌গার অপরকে পীড়া দেয়।

এ সত্য আবিষ্কার করতে বিনুর বিশ বছর কেন তার বেশি লাগল। কিন্তু বারো-তেরো বছর বয়সে সে যেন এর আভাস পেয়েছিল অপরের রসরচনা আস্বাদন করতে করতে। "সবুজপত্র" পড়তে পড়তে এই কথাই তার মনে এল যে, লিখতে হয় তো বীরবলের মতো।

আর্ট কথাটা সে 'সবুজপত্রে'ই পায়। কথাটা তার মনে তখন থেকে গাঁথা। যদিও তার লিখতে উৎসাহ ছিল না তবু জানতে উৎসাহ ছিল কিসে লেখা আর্ট হয়, কিসের অভাবে আর্ট হয় না, কার কোন লেখা আর্ট, কার কোন লেখা ভালো হলেও আর্ট হতে পারেনি। একবার "সবুজপত্র" পড়বার পর তার দৃষ্টি গেল বদলে। আর যত মাসিকপত্র আগে গো-গ্রাসে গিলত এখন থেকে তাদের গ্রাস করবার আগে সতর্ক দৃষ্টিপাত করল। নভেল নাটক গেলা আগের মতো সোজা বোধ হলো না। গিলতে গিয়ে গলায় আটকাল।

ক্লাসে যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হতো বিনু তাদের একজন ছিল না। সুতরাং তাকে চতুর বলা চলে না। তখনকার দিনে কেউ তাকে চিনতই না। যারা ভালোবাসত তারা চতুর কিম্বা গুণী বলে নয়, বিনু বলেই ভালোবাসত। এমন যে বিনু তাকে চতুর করে তুললেন 'সবুজপত্রে'র লেখকপুঞ্জ। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথও।

চতুর শুধু লিপিচতুর নয়। জীবনচতুর! রবীন্দ্রনাথ বঃ

প্রমথ চৌধুরীর লিপিচাতুর্য জীবনের চাতুর্য। তাঁদের চোখ চতুর, কান চতুর, রুচি চতুর। তাঁদের মন চতুর। এক প্রকার মন আছে, বিদগ্ধ মন। যার সে মন নেই সে যদি লিপিচতুর হতে যায় তবে রসের বদলে দেয় রসাভাস। তাতে প্রাণ জুড়ায় না। একটু চমক লাগে এই যা। 'ঘরে বাইরে'র বা 'চার ইয়ারী'র চাতুর্য ওষ্ঠগত নয়। বৈদগ্ধ্যের বিদ্যুৎস্ফুরণ। 'মেঘদূতে'র চাতুর্যও তাই। এমনি করে ক্লাসিকের প্রতি বিনুর কৌতূহল জন্মায়। কিন্তু তার মনের ছাঁদ রোমান্টিক।

সহজ

কোনো কোনো কবির বেলায় এ নিয়ম খাটে না। তাঁরা লিখতে শিখবেন কি, নিরক্ষর। তাঁরা মুখে মুখে গান বাঁধেন, যেমন মেয়েরা মুখে মুখে ছড়া কাটে। কান সজাগ বলে ছন্দ পতন হয় না, পদের সঙ্গে পদ মেলে। তাঁদের কবিতা লোকের ভালো লাগে চাতুরীর জন্যে নয়, অন্তর্নিহিত মাধুরীর জন্যে। মাধুরী অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। কলাবিদ্যার অপেক্ষা রাখেনি।

বাল্যকালে বৈষ্ণব কবিতা আস্বাদন করে বিনুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার বিশ্বাস হতো না যে চণ্ডীদাস বিদগ্ধ বা চতুর বা কলাবিৎ। অথচ তাঁর পদাবলী হৃদয়ের বার্তা হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিত। চোখে জল আসত। সে জল যেমন বিনুর চোখের, তেমনি কবির চোখের। ব্যথায় ব্যথিয়ে দেওয়া

কি সহজ কাজ! অথচ তিনি সহজ কবি। তাঁর রচনার কোথাও কোনো প্রয়াস নেই।

তখন বিমু এর রহস্য ভেদ করতে পারেনি, পরে করেছে। রস নিবিড় হলে আপনি অপনার পথ করে নেয়, মনের সাহায্য নেয় না। যেসব কবিতা বুকের রক্তে লেখা, মন তাদের উপর খবরদারি করে একটু আধটু বদলে দেয়, নতুবা মনের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সুদূর। সেসব ক্ষেত্রে মনের চাতুরী একটা উপসর্গ, সাধক তাকে ভয় করে। সাধক চায় সম্পূর্ণ সহজ সরল নিরলঙ্কার হতে, সব অভিমান ভুলতে। ঐশ্বর্যের লেশ রাখতে চায় না, বিভূতির পরিচয় গোপন করতে চায়। এও এক প্রকার বৈদগ্ধ্য। কিন্তু মনের নয়, হৃদয়ের। সংসারের পোড় খেয়ে নয়, প্রেমের দহনে।

'বড় কঠিন সাধনা, যার বড় সহজ সুর।' রবীন্দ্রনাথও এ সাধনার সঙ্কেত জানতেন। 'গীতাঞ্জলি' তার সাক্ষী। 'খেয়া' থেকেই বোধ হয় এ সাধনার শুরু। বালক বয়সে যখন 'চয়নিকা' তার হাতে পড়ে তখন সব চেয়ে মিষ্টি লেগেছিল 'খেয়া'র কবিতা। উত্তর কালে সে কবির পূর্ব্ব কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছে। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজ কবি। বিমুর ভালো লাগত কবির উদাসমধুর সুর। বৈষ্ণবের নয়, বাউলের। পশ্চিমের লোক যে তাঁকে মিষ্টিক বলেছিল, ভুল বলেনি। সহজের ছলে যারা পরম সত্য শোনান তাঁরা মিষ্টিক।

সাংবাদিকতা

বিনুর ঠাকুরদা তাকে চায়ের নেশা ধরিয়েছিলেন, বাবা ধরিয়েছিলেন খবরের কাগজের নেশা। একটু বড় হয়ে সে যখন ইংরেজী পত্রিকা পড়ল তখন তার নেশাকেই করতে চাইল পেশা। তাও স্বদেশে নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে, প্রধানত আমেরিকায়। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষায়। সুধীন্দ্র বসু, সন্ত নিহাল সিং, এঁদের দৃষ্টান্ত তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছু কালের জন্যে সাহিত্য চলে গেল তার দৃষ্টির আড়ালে।

বিনুর স্বভাবে একটা অস্থিরতা ছিল। সে কোথাও চুপ করে বসে থাকতে পারত না, চারদিক বেড়িয়ে আসত বিনা কাজে। দেশ-বিদেশ বেড়ানো তার আশৈশব সাধ। বিদেশ বলতে যদিও বহু দেশ বোঝায় তবু তার পক্ষপাত অতি অল্প বয়স থেকে আমেরিকার উপর। একদিন তার বাবা তাকে বলেছিলেন সে বড় হলে জর্জ ওয়াশিংটন হবে। একখানা বই তার হাতে পড়েছিল তাতে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিকথা ছিল। ওয়াশিংটনের মতো জেফারসনকেও তার ভালো লেগেছিল এবং পরবর্তী যুগের লিংকনকে। স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকা, সেখানে সব মানুষ সমান, সেখানে প্রাচ্য পাশ্চত্য ভেদ নেই, সেখানে যে-ই যায় সে-ই উন্নতি করে। ইংরেজী মাসিকপত্রে আমেরিকাপ্রবাসী ভারতবাসীদের জবানবন্দী পড়ে সে দিন গুনত কবে বড় হবে, কবে জাহাজের

খালাসী হয়ে সাগর পাড়ি দেবে। তারপর আমেরিকায় পৌঁছে খবরের কাগজের আপিসে ভরতি হবে।

সেদেশে বা এদেশে কলেজে পড়বার বাসনা কোনো কালেই তার মনে উদয় হয়নি, তার বাবাও তেমন বাসনা জাগিয়ে দেননি। তিনি নিজে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করার আগে জীবন সংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই জীবনসংগ্রামকে স্কুলকলেজের চেয়ে কার্য্যকর শিক্ষায়তন বলে বিশ্বাস করতেন। স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে মানুষ হয় ক'জন! প্রায় সবাই তো গোলাম। তাঁকেও চাকরি করতে হয়েছিল বলে চাকরির উপর তাঁর অভিশাপ ছিল। তাঁর ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে এই প্রার্থনা তিনি করতেন, চাকুরের মতো চাকুরে হবে এ প্রার্থনা নয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক, ইস্তফা দিয়েছিলেন একবার। তাঁকে আঠারো বছর বয়সে চাকরি করতে হয়েছিল বাপ-মা'র খাতিরে, ভাই-বোনের খাতিরে। বিনুকে যেন পরিবারের খাতিরে চাকরি করতে না হয়।

খেলাঘর

কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের একটি সনেট আছে, তাতে তিনি বলেছেন স্বাধীনতার খেলাঘর পাহাড় আর সমুদ্র। বিনুর জন্ম পাহাড়ের দেশে। পাহাড়গুলো ছোট কিন্তু মানুষটি আরো ছোট। ছেলেবেলায় তাই তার মনে হতো এসব পর্ব্বতের চূড়া আকাশে ঠেকেছে, হাত বাড়ালেই স্বর্গ। এদের

আড়ালে কি অন্য কিছু আছে? না বোধ হয়। পৃথিবী ফুরিয়ে গেছে পাহাড়ের ওপারে।

দিনের পর দিন সকালে বিকালে দুপুরে দেখা হয় তাদের সঙ্গে, দেখা হয় রাত্রে, জেগে থাকলে রাত দুপুরে! বাড়ী থেকে সব সময় দেখা যায়, কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয় না। সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত দেখতে চাইলে পাহাড় না দেখে উপায় নেই। আষাঢ়ের নব মেঘ পাহাড়েই পতাকা ওড়ায়। বৃষ্টির পরে ধীরে ধীরে যবনিকা ওঠে, রঙ্গমঞ্চে সমাসীন—শৈল।

এই সব খেলার সাথীর সঙ্গে একটানা চোদ্দ-পনেরো বছর কাটিয়ে বিন্নু স্বাধীনতার মূল্য বুঝেছিল। কী করে বুঝল তা কী করে বোঝাবে! কিন্তু তার কাছে তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার প্রশ্ন তখনি ওঠে যখন স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান অনুভূতির জন্যে দাম দেবার তাগিদ আসে। তেমন তাগিদ পরে তার জীবনে এসেছে, কিন্তু তার দ্বারা স্বাধীনতার মূল্য কমেনি, বরং স্বাধীনতা যে কত মূল্যবান সেই কথাই মনে হয়েছে। যে নারী তার একমাত্র বাস দান করেছিল প্রভু বুদ্ধের জন্যে তার কাছে তার একমাত্র বাসের যা মূল্য বিন্নুর কাছে তার স্বাধীনতারও তাই।

চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে সমুদ্রসন্দর্শন ঘটল। সন্ধ্যাবেলা পুরীতে নেমে তার প্রথম কাজ হলো সাগরসম্ভাষণে বেরোনো। অন্ধকারে কানে আসছিল অনাস্বাদিত কলরোল, গায়ে লাগছিল স্নিগ্ধ সিক্ত বাতাস। এমন প্রবল আকর্ষণ সে জীবনে অনুভব করেনি। সমুদ্র তাকে মাতাল করল। তার পরে তার পড়ার

ব্যবস্থা হলো পুরীতে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সমুদ্র তীরে কাটল। সমুদ্রের সঙ্গে তার পরিচয় পাকা হলো, যেন কত কালের সখা। কলেজের বক্ষে সমুদ্র তাকে ডাক দিত পুরীতে। পরে একদিন সে সমুদ্রযাত্রাও করল। তার জীবনের উপর স্বাধীনতার ছাপ আঁকা হয়ে গেল সিন্ধুর নীল রঙে।

মন্দির

বিনুর যেখানে জন্ম সেখানকার প্রাণ ছিল মন্দির। প্রাচীন ভারতের মন্দিরকেন্দ্র সভ্যতা দেশীয় রাজ্য থেকে এখনো বিলুপ্ত হয়নি, অন্তত তখন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। বিনুর মা ঠাকুমা প্রায়ই মন্দিরে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে বিনুও। মন্দির যেমন বৃহৎ তার বেড়া তেমনি বিস্তৃত। সে যে কেবল মূর্তির পায়ে মাথা ঠেকাত তা-ই নয়, বিরলে বসে এমন কিছু পেত যা সব ধর্ম্মের সার অনুভূতি। বাড়ীতে ফিরতে তার ইচ্ছা করত না। ফিরত, কারণ না ফিরলে নয়। এও এক প্রকার পলায়ন। এ পলায়ন সংসার থেকে সংসারের বাইরে নয়, সংসারের মূলে। অনন্ত অসীম অপার বিশ্বের অধিবাসী বিনু, সংসার সে পরিচয় ভোলে ও ভোলায়, মন্দিরে গেলে মনে পড়ে। নয়তো পুণ্য করার জন্যে তার মাথাব্যথা পড়েনি। এমন কী পাপ করেছে যে পুণ্যের জন্যে মন্দিরে মাথা খুঁড়বে?

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার একটা কৌতূহলও ছিল। তাই তার কাকার সঙ্গে গির্জায় গেছল, যোগ দিয়েছিল উপাসনায়। মসজিদে যায়নি, কিন্তু মহরমে লাঠিখেলার জন্যে তাকে ও

তার ভাইকে বলা হয়েছিল। ঠাকুমার মানৎ। বাড়ীতে সত্য পীরের সিন্নি আসত, যিনি আনতেন তাঁর নাম বোখারী সাহেব। তাঁকে বিনুরা ভক্তি করত। এই ভক্তিবৃত্তি তাকে একাদশীর উপবাস করিয়েছে, যদিও দয়াময়ী মা তাকে ফলার খাইয়ে উপবাসের জ্বালা জানতে দেননি। নগরকীর্ত্তনে বাহু তুলে নাচিয়েছে, যদিও সেটা হরির লুটের লোভে উদ্বাহু হওয়া।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ক্রমশ তাকে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসবান করে। সে সাকারবাদে আস্থা হারায় চিরকালের মতো। তার পরে যদি বা মন্দিরে গেছে তা উৎসবের টানে, সৌন্দর্যের খোঁজে। ধর্ম্ম বাদ দিলেও আমাদের সভ্যতার অনেকখানি থাকে, মন্দির তার কেন্দ্র। মন্দির বাদ দিলে ঐতিহ্য বাদ দেওয়া হয়। বিনু তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, প্রস্তুত নয়। সে সাকারবাদী না হয়েও হিন্দু, কারণ সে তার স্বদেশের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু এর জন্যে যতটা নৈতিক সাহসের দরকার ততটা তার নেই। মন্দিরে যাব, মাথা নোয়াব না, প্রসাদ পাব না, কী করে তা সম্ভব ? অগত্যা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। এটা একটা সমাধানই নয়। এইটেই পলায়ন।

রহস্যময়ী

দেবমন্দির বললে শুধু দেবতা নয়, আরো অনেককে বোঝায়। শহরে সকলে সমবেত হয় সেখানে, মেয়েদেরও অবাধ গতি।

সব জাতের, সব শ্রেণীব মেয়ে। বিন্নু একটু কম বয়সে পেকেছিল। না পাকবেই বা কেন? ছ'মাস বয়স থেকে তার বিয়ের নির্ব্বন্ধ লেগে রয়েছিল। অতগুলি কনের সঙ্গে বিয়ে হলে তার বিরাট অন্তঃপুর হতো। যাকেই দেখেন তাকেই নাতবৌ করবেন বলে কথা দেন তার ঠাকুমা। বেচারা বিন্নু সবুর করতে করতে নিরাশ হয়। কেন বৌ আসছে না সুধালে জবাব পায়, বড় হলে আসবে। বড় হওয়া কি তার হাতে? বিন্নু হাল ছেড়ে দেয়। বিয়ের। কিন্তু চোখের দেখার নয়। মন্দিরে গেলে যাঁদের দেখা পায় তাঁরা দেবী নন, মানবী। অথচ বিন্নুর কাছে তাঁদের আকর্ষণ দেবতার অধিক। এখানে খুলে বলতে হয় যে বেশি বয়সের মেয়েদের উপরেই তার দৃষ্টি ছিল বেশি। কারণ তাঁরা বালিকা নন, নারী! রহস্যরূপিণী!

আমাদের পুরাতন সভ্যতায় নরনারীর মেলামেশার ও চেনাশোনার প্রধান স্থল ছিল মন্দির বা মেলা। রথযাত্রায়, শিবরাত্রিতে, দোলপূর্ণিমায়, ঝুলনের রাতে, রাসপূর্ণিমার ভোর-বেলার স্নানে, বারুণীর যোগে—বিন্নুর জন্ম বারুণীর দিন—বিন্নু তাঁদের দেখতে পেত যাঁদের দেখা মিলবার নয়। তখনকার দিনে অবরোধ প্রথা এখনকার মতো শিথিল হয়নি। কয়েকটি পরিচিত পরিবারের মধ্যে যাওয়া আসা চলত, কিন্তু সেগুলি তো এক একটি গোষ্পদ। মন্দির না থাকলে, মেলা না থাকলে, স্নান না থাকলে অবরোধ প্রথার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সমাজের সব পুরুষকে বঞ্চিত করত সব রমণীর শ্রী থেকে। কূপের মধ্যে রূপ দেখা যেত না বিচিত্ররূপিণীর।

রথযাত্রার দিন দলে দলে সুসজ্জিতা যাত্রিণী তাদের বাড়ী আসত পল্লী অঞ্চল থেকে। জল খেতে চাইত, গল্প করত বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে, সম্বন্ধ পাতিয়ে যেত চির দিনের। রথযাত্রার রাত্রে রথের পাশে মহিলাদের সমাবেশ হতো, মা ঠাকুমাদের সঙ্গে বিনুও থাকত। দেবতার প্রতি ভক্তি ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু মানবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি দুর্ব্বার। তখনো সে দেহসচেতন হয় নি, কিন্তু রূপসচেতন হয়েছিল। সাজসচেতন, মাধুরীসচেতন। রহস্যসচেতন।

সম্বন্ধ

সম্বন্ধ পাতানোর প্রথা বোধ হয় ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা। কোনো দিন যাকে চিনিনে সে একদিন হঠাৎ এসে পরিচয় দিয়ে বলে, আমি তোমার মেসো। কেননা, তোমার মা আমার স্ত্রীকে বোন বলে ডাকতেন। কিম্বা আমি তোমার ভাই। তোমার বাবা আমার বাবাকে ভাই বলতেন। কিম্বা আমি তোমার শাশুড়ী।

বিনুর জীবনে এ রকম হরদম ঘটত। তাদের বাড়ী কেবল যে রথযাত্রার দিন গ্রামের মেয়েরা আসত তাই নয়, আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। এক দল সাপুড়ে বছরে এক বার করে অতিথি হতো। ঠাকুরদাকে তারা শ্রদ্ধা করত, তিনি সাপের মন্ত্র জানতেন। নানা রকম তুকতাক, গাছগাছড়া, ওষুধপত্র জানা ছিল তাঁর। গরু বাছুরের সেবা ও চিকিৎসা

তাঁর মতো কেউ জানত না। সাপুড়েরা তাঁরা "জারমহুরা" দিত। সাপের মাথার মণি দিত। বিনুর সঙ্গে তারা সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। তাদের একজনকে সে দাদা বলে ডাকত।

দোকানদারদের অনেকেই ছিল তার মেসো। তাদের একজন তাকে একটা "ডারা" দিয়েছিল। খঞ্জনীর মতো। বিনুর সেটা ছিল প্রিয় বাজনা। এমনি রাজ্যিশুদ্ধুর সঙ্গে তার একটা না একটা সম্বন্ধ পাতানো হয়েছিল, সাধারণত তার অজ্ঞাতে। সম্বন্ধ পাতানোর ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন তার ঠাকুমা। তাঁর বেয়ানদের সংখ্যা অগণিত, কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা তারা সব জাতের। ধোপানী, গয়লানী, ময়রানী, মালিনী, মেথরানী কেউ বাদ ছিল না। ঠাকুমা যদিও সেকালের লোক, তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকম উদার। হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত, মুসলমানদের গোলেবকাওলী, ক্রিশ্চানদের দু-চারটে গল্প ও দেশবিদেশের রূপকথা ছিল তাঁর ঝুলিতে। তাই তাঁর পাতানো বেয়ান বা মেয়ে বা নাতী-নাতনীদের মধ্যে মুসলমান ক্রিশ্চানও ছিলেন। বিন্নুর মা'র শুচিবাতিক, তাই তাঁরা বড় একটা আসতেন না বিন্নুদের বাড়ী। কিন্তু বিন্নু তাঁদের বাড়ী মাঝে মাঝে যেত। মুরগির ডিম খেতে চাইলে যেতে হতো পাঠান মাস্টারনীর বাড়ী। তিনি ছিলেন পিসীমা কি খুড়ীমা। এক দিন তিনি এক হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে অন্তর্ধান করেন। হালুয়া আসত এক মুসলমান হাকিমের বাড়ী থেকে। তিনি ছিলেন পাতানো ভগ্নীপতি। বিন্নুর মা অতটা পছন্দ না করলেও তাঁরও ছিলেন অনেকগুলি পাতানো ভাই-বোন বাপ-

মা। বিন্নু তাঁদের বাড়ী যেত। তাঁদেরও বিভিন্ন জাত। এমনি করে বিন্নু জাতিভেদে বিশ্বাস হারায়।

শ্রেণীভেদ

রাজবাড়ীতে কত বার গেছে, রাজারা কেমন থাকতেন তাও অজানা ছিল না। আবার 'পাণ'দের পাড়ায়, 'শবর'দের পাড়ায় বেড়িয়েছে, তারা কেমন থাকতো তাও তার জানা। সমাজের শ্রেণীবদ্ধ রূপ তার চোখে পড়েছিল, কিন্তু একালের মতো পীড়া দেয়নি। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছেদ ও বিরোধ এমন করে দৃষ্টি ছায়নি।

ঐ যে পাতানো সম্বন্ধের কথা বলেছি ও প্রথা যত দিন সজীব ছিল ততদিন উঁচু-নীচুর ব্যবধান সহ্য হয়েছিল। কিন্তু ওটা মৌখিক সম্বন্ধ। বোধ হয় তাও নয়, এখন কেউ কারুর সঙ্গে মৌখিক সম্বন্ধও পাতায় না সহজে। মৌখিক সম্বন্ধের দ্বারা এত বড় একটা ব্যবধান চাপা পড়বার নয়। মুখোস খসেছে। তাই শ্রেণী-সমস্যা আজকের দিনে মহাসমস্যা।

যে করেই এর সমাধান হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই সম্প্রীতির স্মৃতি বিন্নুর মনে উজ্জ্বল রয়েছে ও রইবে। যাদের সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তার পিতামাতার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তারা মুখের সম্বন্ধকেও সত্য সম্বন্ধ বলে তাকে একদিন বিশ্বাস করতে দিয়েছিল। বিশুদ্ধ স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা তার বরাতে জুটেছিল সমাজের অসম স্তরে। এখনকার দিনে এটা স্বপ্ন। তখনকার দিনে কিন্তু বাস্তব।

একজনের জীবনে এককালে যা বাস্তব হয়েছে তা সর্বজনের জীবনে সর্বকালে বাস্তব হবে না কেন, যদি তার মধ্যে সত্য থাকে ?

কবি তো সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে জন্মায় না, সে কাজ অন্যের। কবি যা দেখে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার জীবনে তো সত্য। সে যদি সকলের প্রতিনিধি হয়ে থাকে তবে সকলের জীবনেও সত্য। যদি সব কালের প্রতিনিধি হয়ে থাকে তবে সব কালের জীবনেও সত্য। বিন্নু আজ বড় হয়েছে বলে তার ছোটবেলার বিশ্বাস হারাবে না। বিশ্বাস হারানো যে বিশ্বাসঘাতকতা। তার পাতানো মাসীপিসী ভাইবোন মিতাদের প্রতি।

কবিরা যদি এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচে, মানুষ বাঁচবে। আর সাহিত্য যদি অবিশ্বাসীদের হাতে পড়ে তবে শ্রেণীসংঘাতের বিষফোঁড়া সমাজের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে সাহিত্যেও সংক্রামিত হবে। হচ্ছেও।

ঐতিহ্য

বিন্নু যদি কোনো দিন লেখাপড়া না শিখত, পেয়ারা গাছে বসে সারাদিন কাটাত, পুকুরের জলে দিনের বেলা সাঁতার কেটে সন্ধ্যা বেলা আবার ঝাঁপ দিত, তা হলেও রামায়ণ মহাভারত ও বৈষ্ণব কবিতা তাকে ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রাখত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীও। তার ঠাকুমা তাকে মুখে মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলেছিলেন, মোটামুটি নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ

রূপে। বই পড়ে সে তার বেশি শেখেনি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দুটি গল্পও সে তাঁর মুখে শুনেছিল। বাড়ীতে চণ্ডী পড়া হতো সুর করে। বিন্নু প্রথমে ছিল শ্রোতা, পরে হলো পাঠক। আর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী তো কীর্তনের সময় তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল। সেও হতো দোহার। থিয়েটার, যাত্রা ও কথকতা তাকে প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজ্ঞান করেছিল। বিনা অধ্যয়নে।

এর প্রভাব তার জীবনব্যাপী। অতীতের সম্মোহন তাকে স্বকালের প্রতি অচেতন করেনি, সে অতীত বলতে অজ্ঞান নয়, বরং অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্যে বর্তমান ভারতের এ দশা, এ কথা সে উচ্চকণ্ঠে জানায়। নির্মম ভাবে সমালোচনা করে। কিন্তু গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করলে প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে যাবে, দেশ থাকবে বটে, কিন্তু দেশের মাটিতে রস থাকবে না। যে দেশের অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎ নেই। অতীত নেই মানে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্রও নেই। ভবিষ্যৎ নেই মানে নব নব উন্মেষশালিনী সংস্কৃতি নেই। মিশরের যা হয়েছে।

যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না। দেশের যেসব সন্তান ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রাণে এই ছেদবেদনা রয়েছে বলেই তাঁদের কাছ থেকে তেমন কোনো সৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা ইসাই হয়েছেন তাঁরা কিন্তু সূত্রচ্ছেদ করেন নি। তাই "মেঘনাদ বধ" সম্ভব হয়েছে। বিন্নুর জীবনে বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ ঘটেছে, বিদেশের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু তার স্বদেশের ঐতিহ্য থেকে চার-পাঁচ হাজার বছরের

ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে, ততোধিক পুরাতন শিকড় থেকে সে তার আপনাকে বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত করেনি। ভারতের কবি-পরম্পরায় বিন্দুও একটি মুক্তা। এক সূত্রে গাঁথা।

স্বকাল

কিন্তু কবি হলো সে কবে! কবিকে আড়াল করে দাঁড়াল সাংবাদিক। তার সাংবাদিক হতে চাওয়ার হেতু তার স্বকালের প্রতি টান। অক্ষর-পরিচয় হতে না হতেই তার হাতে পড়ল খবরের কাগজ। তার কাছে দূত পাঠাল বর্তমান কাল। শেষে এমন হলো যে সে নিজেই দূত হ'তে চাইল। সাংবাদিক হচ্ছে বার্তাবহ। যে বার্তা সে বহন করে সে বার্তা যুগের। বার্তাবহের সেইজন্যে দেশবিদেশ নেই, যদি থাকে তো আকস্মিক। না থাকলেও চলত। কিন্তু কালবোধ আছে। না থাকলে চলত না।

বিন্দুর কালবোধ তার দেশবোধকে একেবারে ঢেকে না রাখলেও ধীরে ধীরে ঢাকছিল মেঘ যেমন করে আকাশকে ঢাকে। দিন রাত আমেরিকার কথা ভাবতে ভাবতে সে হয়তো কিছু দেশবিমুখ হয়েছিল। তাই অমৃতসর তার প্রাণে সাড়া তোলেনি ও অসহযোগের প্রস্তাব তার কাছে সংকীর্ণ-চিত্ততার পরিচয় বয়ে এনেছিল। কিন্তু দেশ যখন ক্রমে ক্রমে আগুন হয়ে উঠল তখন আগুনের আঁচ লাগল তার গায়েও। সে অসহযোগ করবে স্থির করল। পরীক্ষাটা নামমাত্র দিল, ফল খারাপ হবে জানত, এবং খারাপ হলেও কোনো ক্ষতি ছিল

না, কারণ কলেজে যেতে তার রুচি ছিল না। অথচ জেলে যেতেও মতি ছিল না।

তারপর সাংবাদিক হবার জন্যে সে রওনা হলো কলকাতায়। সেখান থেকে একদিন সুযোগ বুঝে আমেরিকা পাড়ি দেবে এই ছিল অভিপ্রায়। কিন্তু জাহাজের চেহারা দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। এ জাহাজে গঙ্গা পারাপার করতে ভরসা হয় না, কালাপানি পারাপার করবে! জাহাজের চেহারা দেখে যেমন বিনুর মুখ গেল শুকিয়ে, তেমনি বিনুর চেহারা দেখে সম্পাদকদের। তাঁরা যখন শুনলেন যে ও ছেলে ইংরেজী বাংলা দুটো ভাষাতেই লায়েক, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে চায়, তখন কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ভাবলেন। তারপর একজন বললেন, তুমি আপাতত তর্জমা করো। অপর জন বললেন, প্রুফ সংশোধন করো। একজনও একটা "যৎকিঞ্চিৎ" লিখতে দিলেন না দেখে বিনু অবাক হলো। দিন কতক পরে তার শরীর বেঁকে বসল, আর সহকারী গোছের এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন, আগে গ্রাজুয়েট হও, তার পরে এ লাইনে আসতে চাও এসো। কথাটা বিনুর মনে বাজল। কিন্তু বাড়ী ফিরে সেরে উঠে কলেজেই ঢুকল সে।

এ. ই.

শরীর অন্তরায় না হলে বিনু বোধ হয় একূল ওকূল দুকূল হারাত। না হতো তার আটলান্টিকের পশ্চিম কূলে যাওয়া, অর্থাৎ আমেরিকায়। না হতো আটলান্টিকের পূব কূলে,

অর্থাৎ ইংলণ্ডে। যেদিন কলেজে ঢুকল ঘাড় হেঁট করে সেদিন জানত না যে নিয়তি তাকে এক কূল থেকে ফিরিয়ে দিল আর এক কূলে টানতে।

কলেজে ঢুকলেও বিনুর সংকল্প অটুট রইল। সে গ্রাজুয়েট হয়ে খবরের কাগজের আপিসে কাজ করবে, সেই তার পেশা। এবং নেশা। যেখানে যত পত্রিকা পায় পড়ে, মনে মনে লিখতে শেখে। হাতে কলমেও একটু আধটু লিখত। কিন্তু ছাপতে দিত না।

ক্রমে তার আদর্শ হয়ে উঠলেন আইরিশ কবি ও সম্পাদক জর্জ রাসেল। তাঁর ছদ্ম নাম এ. ই.। তাঁর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, তাতে তিনি লিখতেন চাষী গয়লা তাঁতী কামার প্রভৃতির দরকারী কথা। কী করে ফসল বাড়ানো যায়, পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে বাঁচানো যায়, কী করে সমবায় পদ্ধতিতে কেনাবেচা করতে হয়, দালালকে বাদ দিতে হয়, উৎপাদন ও বিনিময়ের ব্যবস্থা কেমন করে ধনশক্তির হাত থেকে জনশক্তির হাতে আসবে, অথচ হানাহানি বাধবে না।

তাঁর স্বদেশের কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট ছিল তাঁর জীবন। তাঁর সম্পাদনা ছিল জীবনব্রতের উদ্‌যাপন। তেমন কোনো জীবনব্রত যার নেই সে যদি সম্পাদনা করে তো সংসার চালানোর জন্যে। বিনুর সংসারী হতে ইচ্ছা ছিল না। বিবাহের উপর তার বিরাগ জন্মিয়েছিল। অথচ প্রণয়ের উপর ছিল পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা। সে ভালোবাসবে, কিন্তু বিয়ে করবে না, বাঁধা পড়বে না। ভালোবাসার ফলে যদি সন্তান হয় তার দায়িত্ব নেবে

সমাজ। সমাজকে তার জন্যে ঢেলে সাজতে হবে। সমাজ-সংস্কার হবে বিন্নুর অন্যতম ব্রত। তা ছাড়া, দেশ উদ্ধার তো রয়েছেই। আমেরিকা যদি যায় তো ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রচারকার্য চালাবে।

নিজের কলমের উপর তার আস্থা ছিল, কিন্তু সে কলম সাহিত্যিকের নয়, সেবকের তথা সংস্কারকের। তখনো তার অন্তরে রসের উপচয় হয়নি। সে আবিষ্কার করেনি সে রসিক, সে কবি।

গান্ধীজী

যীশু জন্মগ্রহণ করবেন জানতে পেরে কয়েকজন জ্ঞানী তাঁর জন্মস্থানে যাত্রা করেছিলেন নবজাতককে দর্শন করতে। দর্শন করে তাঁদের সন্দেহ জন্মাল। এ কি জন্ম! না, এ মৃত্যু! প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁদের মনোভাব কেমন হলো তা টি. এস. এলিয়ট থেকে উদ্ধার করি।

"............I had seen birth and death,
But had thought they were different ;
this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death,
our death.
We returned to our places, these Kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation,
With an alien people clutching their gods."

ভারতের রাজনৈতিক আস্তাবলে গান্ধীজী যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখনকার দিনের জ্ঞানীরা বড় আশা করে হতাশ হলেন। ছোট হরফের 'গড'গুলির নাম আধুনিক সভ্যতা, অতিকায় যন্ত্রপাতি, পার্লামেণ্টারি শাসন, সশস্ত্র বিপ্লব, যেন তেন প্রকারেণ উদ্দেশ্যসিদ্ধি, প্রয়োজন হলে অসত্যাচরণ। বড় 'গড'টির নাম স্বরাজ। গন্ধীজীকে তাঁরা বরণ করেছিলেন স্বরাজের খাতিরে। তা বলে তাঁরা মিলের কাপড় ছেড়ে চরকার সূতোর খদ্দর পরবেন কোন্ দুঃখে! কাউন্সিল য্যাসেম্বলীর মায়া কাটাবেন ক' দিন! হানাহানি না করলে তাঁদের পৌরুষ ক্লীবত্ব পাবে যে! উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অহিংস উপায় মেনে নিলেও সেই উপায় যে একমাত্র বা অব্যর্থ এ বিশ্বাস তাঁরা পোষণ করবেন কোন্ যুক্তিবলে! সত্যের উপর এতখানি জোর দিলে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া উচিত, কর্মক্ষেত্রে ওসব চলবে কেন! আর আধুনিক সভ্যতা! আহা! স্বরাজ চাই বলে দু'শো বছর পেছিয়ে যাব!

জ্ঞানীদের জীবন থেকে সোয়াস্তি চলে গেল কিন্তু। বিনুর জীবন থেকেও। গান্ধীজী যে ক্ষণজন্মা পুরুষ সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর জন্ম যে একটা যুগের মৃত্যু, শুধু বৈদেশিক শাসনের নয়, সেটাও তো প্রত্যক্ষ। বিনু বিষম দোটানায় পড়ল। গান্ধীজীর "হিন্দ্ স্বরাজ" তাকে চমৎকৃত করল। সেও হাড়ে হাড়ে নৈরাজ্যবাদী। কোনো রকম শাসন তার সয় না। নিয়ম যদি মানতে হয় তবে তা অন্তরের নিয়ম। অথচ গান্ধীজীর কথায় দু'শো বছর পেছিয়ে

যেতে সে একেবারেই নারাজ ছিল। না হয় নাই হলো স্বরাজ।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি তাঁর দেশের অসম্মান অসহায়ের মতো অবলোকন করবার পাত্র নন। সুতরাং তিনিই যখন গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির প্রতিবাদী হলেন তখন বিনুর মতো অনেকের একটা জবাবদিহি জুটল। নইলে কলেজে পড়ার কলঙ্ক কপালে জ্বলজ্বল করত। বিনু ইতিমধ্যে কবির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল, এখন থেকে গোঁড়া রবীন্দ্রপন্থী হলো। যাকে বলে অন্ধ ভক্ত। ওদিকে গান্ধীজীর জন্যে তার একটা দুর্বলতা ছিল। বোধ হয় 'হিন্দ্ স্বরাজ'-এর প্রভাবে। তাই মোটা ভারী খদ্দরের বাহন হলো, তার নিজের চেয়ে তার পোশাকের ওজন বেশি। এদিকে রবীন্দ্রনাথের অনুসারক কি-না। তাই ওগুলোকে রাঙিয়ে নিল নানা রঙে। এমন ডগডগে রং যে এক ক্রোশ দূর থেকে ষাঁড় তাড়া করে আসে। জন বুল নয়, জনতার চক্ষু। তখনকার দিনে রঙের দোষ ছিল ওই।

যদিও সে কবির প্রায় সব রচনাই পড়েছিল, পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল, তবু তাঁর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঠিক সাহিত্যঘটিত ছিল না। ছিল ধর্মবিশ্বাস জনিত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের ঋষি, আর বিনু ছিল জীবনজিজ্ঞাসু। তার জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর গান্ধীজীর মুখে ছিল না, ছিল রবীন্দ্রনাথের মুখে। তিনি

বিনুর মতো জিজ্ঞাসুদের ডাক দিয়ে যেন বলতেন, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা তার মনে এলো মাতৃবিয়োগের পর থেকে। তার এত বড় শোকে শান্তি দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'। এগুলি সে সাহিত্যহিসাবে পড়েনি, কাব্য কি-না বিচার করেনি। বাণীর জন্যে পড়েছে, অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি যাই—কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।" এসব তো পড়ে-পাওয়া তত্ত্ব নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যিনি উপলব্ধি করেছেন তিনিই তো ঋষি, সত্যদ্রষ্টা। বিনু তাঁকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিল। সেই জন্যে তিনি যখন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে 'সত্যের অহ্বান' লিখলেন তখন বিনুর প্রত্যয় হলো যে মনের মতো জবাবদিহি মিলেছে।

অমরত্ব

পুঁথিতে যেমন এক অধ্যায় সারা না হলে আর এক অধ্যায় শুরু হয় না, জীবনে তেমন নয়। জীবনে এক সঙ্গে তিন-চার অধ্যায় চলে। বিনুর জীবনে যখন সাংবাদিকতার চন্দ্রগ্রহণ তখন সাহিত্যের আলো এক দম নিবে যায়নি, অবচেতনায় অবস্থান করছে। সে যদি মরে তবে তার আত্মা অমর হবে, কিন্তু তাই যদি যথেষ্ট হতো মৈত্রেয়ী কেন প্রশ্ন করতেন, যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম? অতএব আত্মার অমরত্ব

যদিও ধ্রুব তা হলেও আর এক অমরত্ব আছে, তার সাধনা করতে হবে। বিনা সাধনায় যা পাবার তা তো পাবোই, সাধনা করে যা পাবার তা যেন অর্জন করি।

সে যখন মরে যাবে তখন কি এমন কিছু রেখে যাবে না যা অমর? যা অমর হয়েছে বিশেষ কোনো অনুভূতির বা উপলব্ধির দৌলতে? যা মানবজীবনের চরম অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ? রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তিনি অমর, যে অর্থে মানবাত্মা অমর। উপরন্তু অমর, যে অর্থে তাঁর বাণী অমর, সৃষ্টি অমর। বিনু কি তাঁরই মতো সৃষ্টি করে যাবে না কিছু যাতে বিনুকেও অমর করে রাখবে? যে অমরত্ব সৃষ্টিসাপেক্ষ তার জন্যে বিনুর অন্তরে একটা আকুলতা জাত হলো। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আমার কীর্তির মধ্যে। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

সে সৃষ্টি করবে। কী সৃষ্টি করবে? করতে চাইলেই কি অমনি হয়? পুঁজি লাগে না? কোথায় তার পুঁজি? দেখল, সে যা উপলব্ধি করেছে তাই তার পুঁজি, কিন্তু তা কতটুকু! পুঁজি বাড়ানো দরকার। বই কাগজ পড়ে পুঁজি বাড়ে না। বাড়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লে। পথের দু'ধারে ছড়ানো রয়েছে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দু'হাতে তুলে নিলে পুঁজির অভাব হয় না। দশখানা বই পড়ে একখানা বই লিখতে সবাই পারে। কিন্তু সে বই সবাই পড়ে না। লেখকের আগেই তার লেখার বিলোপ ঘটে। বাকি যা থাকে

তা জাদুঘরের কঙ্কাল। তেমন ভাগ্য কে চায়! বিনু চায় তার লেখা জীবনে চিরজীবী হবে, জাদুঘরে নয়। সাধারণের জাদুঘরে নয়, প্রতি জনের জীবনে। তার আবেদন নিত্যকালের প্রতিটি পাঠকের প্রতি। তার আয়োজনও তদনুরূপ হবে।

খাঁচার পাখী

কলেজের ছ'বছর সে খাঁচার পাখীর মতো কাটিয়েছে বনের পাখীর ব্যাকুলতা নিয়ে। কলেজকে সে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি, করবে না। প্রথম যৌবনের ছ'টি বছর যেন ছ'টি যুগ। যৌবন এত অফুরন্ত নয় যে এই নিদারুণ অপচয় সইবে। এর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, এটা নিতান্তই ক্ষতি। তবে লোকসান না পোষালেও মানুষ একেবারে মারা যায় না, বেঁচে থাকলে সামলে নেয়। সেও এক কথা। তা ছাড়া, লোকসানের মধ্যেও সান্ত্বনার বিষয় একটু আধটু থাকে বই-কি। এও এক কথা।

বিনুর সান্ত্বনা, সে পেয়েছিল জনকয়েক অসাধারণ বন্ধু। জীবনে বন্ধুভাগ্য মহাভাগ্য। তাই কলেজ তার অসহনীয় লাগেনি। লেগেছিল শেষের দিকে যখন দয়িতাভাগ্য এসে সব সান্ত্বনা কেড়ে নিল।

অপর সান্ত্বনা, রাশি রাশি বিদেশী গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ। ইউরোপের ইতিহাস এই সময় তার প্রিয়পাঠ্য হয়। তার থেকে ইউরোপ হলো প্রিয় প্রবাস। ইউরোপীয় সাহিত্য তাকে উন্মনা করল। ইউরোপের জীবন কত বিচিত্র আর ভারতের

জীবন কী একঘেয়ে! এও এক কারণ। আরো এক কারণ, ইউরোপীয় সাহিত্যে দেশকালনিরপেক্ষ বহু মহৎ সৃষ্টি আছে। বিনু যদি সৃষ্টি করে তো বিনুর সৃষ্টি তাদের সমান হওয়া চাই। তার রচনার আদর্শ যেন তাদের চেয়ে খর্ব না হয়।

কিন্তু অতটা সে একদিনে ভাবেনি। সাংবাদিকতা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল অতি দীর্ঘকাল। তার পরে এলো সমাজ-সংস্কারের সংকল্প। সমাজ ভাঙা-গড়ার স্বপ্ন। বিশুদ্ধ সাহিত্যে পৌঁছতে বোধ হয় পূরো ছ'বছরই লেগেছে। গোড়ার দিকে ইবসেন, বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েল্স্, এঁরাই ছিলেন তার প্রিয় লেখক বিদেশীদের মধ্যে। অনুরূপ কারণে শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশীদের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে সে শৈশবে আবিষ্কার করেছিল, অলক্ষ্যে অতিক্রম করছিল। শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ কখন এক সময় তাঁদের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে নয়। টলস্টয় ও রম্যাঁ রলাঁর চেয়ে নয়। ডস্টয়েভ্স্কি ও বালজাকের চেয়ে নয়। শেলী ব্রাউনিং ও শেক্স্পীয়রের চেয়ে নয়। পরবর্তী বয়সের আবিষ্কার গ্যয়টের চেয়ে নয়। চেখভের চেয়ে নয়।

পোষা প্রাণী

সে নিজে খাঁচার পাখী বলে তার স্বভাবিক সহানুভূতি ছিল যেখানে যত খাঁচার পাখী তাদের সকলের প্রতি। মেয়েরাও খাঁচার পাখী। খাঁচার পাখীও বটে, পোষা প্রাণীও

বটে। কেবল যে অবরোধ প্রথা আছে বলে বন্দিনী তা নয়, তারা পরনির্ভর, তাদের স্বতন্ত্র জীবিকা নেই। যেখানে স্বতন্ত্র জীবিকা আছে, যেমন নীচের স্তরে, সেখানেও তারা পুরুষের পোষ-মানা প্রাণী। বনের পাখী নয়। কোনো স্তরেই তাদের স্বভাবে বন্যতা নেই, এমন কি, সমাজের বাইরে যাদের স্থিতি তারাও পুরুষের পণ্য হয়ে ধন্য, তাদের আর্থিক স্বাধীনতা তত দিন পুরুষের নেক নজর যত দিন।

নারীর জন্যে সে যা চেয়েছিল তা বনের পাখীর বন্যতা। নিজের জন্যেও তাই চেয়েছিল। মেয়েরা কলেজে পড়বে কি আপিস করবে, এটা অবশ্য নগণ্য দাবি নয়, কিন্তু এতে কি তাদের জীবন ভরবে! এতে কি আছে পথে বেরিয়ে পড়ার সুখ! পথের ঝড় বৃষ্টি ধূলো! বজ্রপাত বা সর্পাঘাত! এও তার সেই নিরাপদ প্রাণধারণ যার জন্যে নারী বিকিয়ে দিয়েছে তার বন্যতা। হতে পারে এর নাম নরনারীর সমানাধিকার। যারা সাম্য চায় তাদের এই লক্ষ্য। কিন্তু সাম্য তো অনেক সময় জেল কয়েদীর সাম্য। তেমন সাম্য কি কারো কাম্য!

বিনু যদিও ফেমিনিস্ট বলে নিজের পরিচয় দিল, এক প্রোফেসারের ইংরেজী পদ্যের পাল্টা ইংরেজী পদ্য লিখে ছাপাল, তবু তার ফেমিনিজম নরনারীর সমানাধিকারে আবদ্ধ ছিল না, সমান স্বাধীনতার আকাশে ডানা মেলত। এ কথা একবার একটি বাংলা প্রবন্ধে বোঝাতে গেল মাসিকপত্রে। সম্পাদক ছাপলেন; কিন্তু প্রতিবাদ এলো মহিলাদেরই তরফ থেকে। তাঁরা যে মহিলা। এর পরে বিনু হৃদয়ঙ্গম করল যে মেয়েরা

সত্যিকার স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত নয়। পুরুষরাও নয়। সত্যিকার স্বাধীনতা আসবে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে। মানুষের কাছে যখন জীবন যৌবনের অপচয় অসহনীয় হবে, যখন পোষ-মানা প্রাণ রাখা না রাখা এক হবে, তখন চোখের সুমুখে ঝিকিয়ে উঠবে পথ। পথেও নরনারীর সমান অধিকার।

দোরোখা নীতি

সমাজের আমূল পরিবর্তন কবে হবে, তার জন্যে সংস্কারক অপেক্ষা করতে পারে না। বিনুর মধ্যে যে সংস্কারক ছিল সে সংস্কারমুক্তির জন্যে কলম ধরল। এত দিনের একটা ব্রত পাওয়া গেল যার জন্যে জীবনপাত করা চলে।

তার নিজের সংস্কারগুলো একে একে কাটল। বিধবা-বিবাহকে সে ভয় করত। ভয় ভাঙল। বিবাহবিচ্ছেদকে ঘৃণা করত। ঘৃণা ঘুচল। বিবাহ প্রথাটাকে শাশ্বত ভাবত। কোনো প্রথাই শাশ্বত নয়। যার উদ্‌ভব হয়েছে তার বিলয়ও হবে, নিশ্চিত জানল। সতীত্বকে স্বর্গীয় মনে করত। দেখল ওর মধ্যে সাড়ে পনেরো আনা বাধ্যতা ও দাস্য। যেটুকু স্বেচ্ছা সেইটুকুই মূল্যবান। বিবাহপ্রথার বিলয় হলেও সেটুকু থাকবে। বরং তখনি মর্য্যাদা প্রতিপন্ন হবে।

তার পর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল যে নারীর এক বার পদস্খলন হলে সে যাবজ্জীবন পতিতা, অথচ পুরুষের পতন নেই এক দিনও। স্ত্রী থাকতে স্বামী অকারণে আবার বিয়ে করে, কিন্তু স্বামী থাকতে—এমন কি, স্বামীর মৃত্যুর পরেও—স্ত্রী

সকারণে আবার বিয়ে করতে পারে না। বিধবার তবু আইনের বাধা নেই, পতিপরিত্যক্তার সে দিকেও বাধা। নির্যাতিতার দৈব সখা, মানুষ তার শরীরের কষ্ট লাঘব করতে পারে, কিন্তু মনের ওষুধ জানে না, জানলেও কিছু করবে না। রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের দশা দেখে কবির প্রতি তার অভিযোগের ভাব এলো, ঠিক একই কারণে শরৎচন্দ্রের প্রতি মাথার পাগড়ি খুলে পায়ে রাখার ভাব। ইবসেনের প্রতিও। ইবসেনই তো নাটের গুরু।

এই দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইবসনকে মহিমান্বিত করেছিল, শরৎচন্দ্রকেও। বিনুরও মনে হল তার কাজ বিদ্রোহ করে যাওয়া, ফল কতটুকু হবে তা ভেবে দেখবার সময় নেই। এমনি করে সাহিত্যের দিকে তার লেখনীর গতি। নিছক সাংবাদিকতায় অতৃপ্তি। একটা ঠেলা, একটা গরজ তাকে চালিয়ে নিল কথকতার আসরে। তার অন্তিম লক্ষ্য স্বাধীন জীবন, স্বাধীন যৌবন। নরনারী উভয়ের। আপাত-লক্ষ্য সংস্কারমুক্তি। দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

কর্তব্য

বিনুর স্বভাবটা আয়েসী। সে আয়াস স্বীকার করতে চায় না। তার ভালো লাগে পায়চারি করতে, পায়চারি করতে করতে সে ভাবে। ভালো লাগে শুয়ে থাকতে, শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে, কিম্বা পড়ে। কিন্তু ভালো লাগে না বসতে। বসতে ভালো লাগে না বলে তার ভালো করে খাওয়া হয় না,

গল্প করা হয় না, হয় না চিঠি লেখা। এমন যে বিনু সে কোন্ দুঃখে সাহিত্য লিখতে বসে! একটা গরজ, একটা ঠেলা না থাকলে সে লিখতে বসত না, বসলেও উঠে পালাত।

বিশ বছরের বিনুকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, কেন লিখবে, তবে উত্তর পেত, কর্তব্য। নামের নেশা আদৌ ছিল না বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু নামের জন্যে আয়াস স্বীকার করা অন্য কথা। কর্তব্য অবশ্য সামাজিক বা মানবিক। তেমন করে যে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না এ কথা বেশ বুঝলেও তার ঝোঁক ছিল সাহিত্যসৃষ্টির উপর নয়, সমাজসংস্কারের উপর, সংস্কারমুক্তির উপর। মানুষের কতকগুলো বদ্ধমূল সংস্কার সে ভেঙে চুরমার করবে, মানুষ যেসব প্রথাকে বিশ্বাসকে আচারকে এত কাল মূল্য দিয়ে এসেছে সেসব যে মূল্যহীন তা হাতে কলমে প্রমাণ করবে। এর জন্যে যদি উপন্যাস লিখতে হয় তাও সই। কালাপাহাড়ীর জন্যেই কলম ধরা, কষ্ট করে বসা। তবে বিনুর কালাপাহাড়ী বিশুদ্ধ ভাঙন নয়। সংস্কারকেরা ভাঙে বটে, কিন্তু নদীর মতো এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়তে। কী করে গড়তে হয় তাও জানে। কী গড়তে হয় তাও। নব-সমাজের স্বপ্ন দেখা বিনুর দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়েছিল। ওমর খৈয়ামের মতো সে তার কল্পসহচারীকে বলত—

"Ah, Love could thou and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits—and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!"

একটু একটু করে অলক্ষিতে বিনুর ঐতিহ্যপ্রীতি শিথিল হয়ে এলো। নিজেকে সে হিন্দু বলতেও দ্বিধা বোধ করল এবং ভারতীয় বলতেও কুণ্ঠিত হলো। কী তবে সে? যার কোনো লেবেল নেই; নিশ্চিহ্নিত মানুষ।

স্টাইল

কেন লিখবে, এ প্রশ্নের উত্তর, কর্তব্য। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন ছিল। কেমন করে লিখবে? এর উত্তর, যেমন তেমন করে নয়। লেখার স্টাইল বা শৈলী সম্বন্ধে বিনু বরাবরই খুঁতখুঁতে। বিষয়ের উপর পরের ফরমাশ খাটে, পরীক্ষকদের মর্জি। কিন্তু বিন্যাসের উপর বিনুর নিজের রুচি। আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

আয়েসী বিনু একান্ত আয়াসে তার স্টাইলটি সেধেছিল, কখনো মনে মনে, কখনো মুখে মুখে, কখনো লিখে লিখে। চিঠি লেখাও লেখা। সেই যে একটা কথা আছে, ঈশ্বরকে ডাকতে হয় মনে বনে ও কোণে, এও অনেকটা তাই। এ সাধনায় বিনু এক দিনও ঢিলে দেয়নি, আপস করেনি। পরীক্ষার কাগজেও সে তার স্টাইল ফলিয়েছে, সাজা পেয়েছে। আবার পুরস্কারও পেয়েছে। খবরের কাগজের জন্যেও সে যেমন তেমন করে লিখতে রাজী ছিল না, সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখলেও তার লেখার ধরন তার স্বকীয়। স্টাইল তার ভালো কি মন্দ সে ভাবনা তার নয়। স্টাইল তার নিজের হলেই সে খুশি।

এর জন্যে তাকে অনেকের কাছে শিক্ষানবিশী করতে হয়েছে। প্রথমত বীরবলের কাছে, দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের, তৃতীয়ত গান্ধীজীর। ইংরেজীতে বলে স্টাইলের নাম মানুষ বা স্টাইলটাই মানুষ। মানুষটাকে বাদ দিয়ে তার স্টাইলটুকু শেখা যেন চাঁদটাকে বাদ দিয়ে তার আলোটুকু দেখা। সেটা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। বিন্নু যাঁদের শাগরেদ হয়েছে তাঁদের স্টাইলের রূপ নিরীক্ষণ করে নিরস্ত হয়নি, রূপের তলে যে সত্তা, তার অনুসন্ধান করেছে। সত্তার প্রভাব সত্তার উপর পড়ে যত দিন না স্বভাব সুনির্দিষ্ট হয়। আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব কেটে যায়, তার আগে কাটিয়ে উঠতে চাওয়া যেন ঘাটে ভিড়বার আগে নৌকা থেকে লাফ দিতে যাওয়া।

শিক্ষানবিশীর একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে চেনা। এক বার আপনাকে চিনলে তার পর আর অনুসরণ বা অনুকরণ নয়, আপনার পরিচয় দেওয়া, আত্মদান। তার আগে অনুকরণ না হয় লজ্জাকর, অনুসরণেও যার শরম সে সাধক নয়।

কস্মৈ দেবায়

কেমন করে লিখবে, এর উত্তর, নিজের মতো করে। আরো একটি প্রশ্ন আছে, তখনো ছিল। কাদের জন্যে লিখবে? বীরবলের রচনা পড়লে মনে হয় তিনি রসিকদের জন্যে লেখেন, অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে রাজী নন। সংসারে রসিক জন আর ক'জন! শিক্ষাবিস্তারের পরেও তাঁদের সংখ্যা ডজন ডজন বাড়বে না। বীরবল

সকলের জন্যে লেখেন না, এই সিদ্ধান্তই সার। রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের সব রচনা সকলের জন্যে নয়, কতক রসিকদের, কতক খেয়ালীদের, কতক সাধকদের। কিন্তু প্রচুর সর্ব্বসাধারণের।

কলেজে ভরতি হবার আগে বিনু টলস্টয়কে আবিষ্কার করেছিল, সেই টলস্টয়কে যিনি দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচনের মতো নিজের লেখার সমালোচন করেছিলেন, 'সমর ও শান্তি', 'আনা কারেনিনা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্যে অনুতপ্ত হয়ে কৃষকদের জন্যে উপকথা রচেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা নেই। সচরাচর আমরা আমাদের অপকীর্তিকেও মহাকীর্তি ভেবে আত্মহারা হই, অনুতাপ করা দূরে থাক, সন্তানস্নেহে অন্ধ হই। টলস্টয়ের বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না সেরা লেখার উপরেও, যেহেতু সেগুলি চাষী ও চোয়াড়দের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। যেহেতু বারো বছরের ছেলেরা সেগুলি পড়ে বাহাত্তুরে বুড়োদের মতো ব্যথিত হবে না, মানুষকে ভাই বলে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করবে না। যেহেতু সেগুলি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, সভ্য, বিত্তবান ও অবসরবিহারী পরগাছাদের জন্যে। এটা অবশ্য টলস্টয়ের বাড়াবাড়ি। তিনি যখন যা করতেন চরম করতেন। যৌবনকে ভোগ করেছিলেন ভর্তৃহরির মতো, তাই উত্তর বয়সে পাপবোধটা কিছু প্রখর হয়েছিল তাঁর। পাপাচারীদের জন্যে লিখেছেন এ কথা মনে হলেই তিনি শাপ দিতেন নিজের লেখনীকে, ছাপা বইয়ের মুখ দেখতে চাইতেন না।

সে যাই হোক, বিন্দুও ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে একমত হলো যে সব চেয়ে সার্থক সৃষ্টির লক্ষ্য হবে জনসাধারণ বা পীপ্‌ল্। চাষী ও চোয়াড়, মাঝি ও মুদ্দাফরাশ। তারা যদি বিদ্বান ও বিদগ্ধ হয় তো ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই, কেননা চোখের জল ও বুকের রক্ত দিয়ে যে কথা বলা হয় সে কথা সব মানুষের আঁতে ঘা দেয়, হোক না কেন যতই নির্বোধ বা নিরক্ষর। তা বলে আর সব রচনা যে অসার্থক, তা নয়। আর্ট নয় তা নয়।

টলস্টয়

টলস্টয়ের কাছে বিন্দুর শিক্ষানবিশী স্টাইলের জন্যে নয়, স্টাইলকে অতিক্রম করার জন্যে। শিক্ষানবিশীর শুরু কবে, তা মনে নেই, সারা এখনো হয়নি। লেখকের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে পাঠকের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, মাঝখানে কোনো প্রাচীর রাখতে চায় না। অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানও তাকে পীড়া দেয়। সাধকের মতো লেখকেরও শেষ কথা, শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। তন্ময় হওয়ার আগে স্টাইল একটা সহায়, কিন্তু তন্ময় হওয়ার ক্ষণে স্টাইল একটা বাধা। কুঞ্জের দ্বার অবধি গিয়ে সখী বিদায় নেয়, নতুবা সে সখী নয়, সতীন।

টলস্টয়ের কিছুই গোপন নেই, তিনি কিছুই হাতে রাখেননি, যখনকার যা তখনকার তা পাঠকের হাতে সঁপে দিয়েছেন,

জীবন-যৌবন পাপ-পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন, বোধ হয় পেরেছেনও। এর জন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে। সাধকের মতো লেখকেরও শত্রু তার বিভূতি, তার অলঙ্কারের ঝঙ্কার, তার অহঙ্কারের টঙ্কার। ঈশ্বরের কাছে যে ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়ায় সে কি তাঁর আলিঙ্গনের জন্যে জায়গা রেখেছে? সর্ব্বাঙ্গে জড়োয়া ও কিংখাব। সেসব যে খুলে ফেলে দিয়েছে, তাদের আসক্তি কাটিয়েছে, সেই তো উত্তম নায়িকা, উত্তম সাধক। তেমনি উত্তম লেখক। তার অন্তিম পাঠক সব মানুষের অন্তরাত্মা। "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" সেই মানুষের প্রেম পেতে হলে সব ছাড়তে হয়।

এ কেবল স্টাইলের বেলায়, তা নয়। টলস্টয় তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করেছিলেন। জীবনের কাছে সত্যরক্ষার জন্যে তেমন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। যার জীবন সত্য নয় তার লিখন সত্য হবে কোন্ জাদুবলে? সমাজের চিন্তা থেকে কোন এক সময় জীবনের চিন্তা বিনুকে পেয়ে বসল। সেখানেও টলস্টয় হলেন তার দৃষ্টান্ত। কী যে সার, কী যে অসার, এ সম্বন্ধে টলস্টয়ের সঙ্গে তার নির্ণয়ের সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু যুবক টলস্টয়ের সঙ্গে। বর্ষীয়ানের সঙ্গে তার মতভেদই অধিক, কিন্তু সেও স্বীকার করে নিয়েছে যে সাযুজ্যেই মুক্তি। লেখকের মোক্ষ পাঠকের সঙ্গে সাযুজ্য। পাঠক হচ্ছে দৃশ্যত 'পীপল' বা জনগণ। নেপথ্যে সব দেশের সব কালের পাঠকসত্তম। "সেই মানুষ।"

জীবনযাপন

কাদের জন্যে লিখবে, এই প্রশ্নের উত্তর একজন এক ভাবে দেয়, অরে এক জন আর এক ভাবে। যে যেভাবে দেয় সে সেই ভাবে জীবনযাপন করতে প্রস্তুত হয়। কেউ যদি বলে, চাষীদের জন্যে লিখব, তা হলে চাষীদের জীবনের সঙ্গে জীবন জড়ানোর আয়োজন করে। না করলে তার লেখায় চাষীদের জীবনের সুর বাজে না। তেমনি কেউ যদি বলে, মজুরদের জন্যে লিখব, তা হলে তাকে মজুরদের জীবনের সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধতে হয়। না বাঁধলে তার লেখায় মজুরদের জীবনের সুর বাজে না।

জীবনযাপন করার উপর নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত কার লেখা চাষীরা পড়বে, কার লেখা মজুরেরা। অবশ্য এমন হতে পারে যে লেখাপড়া শিখে চাষীরা আর চাষাড়ে থাকবে না, মজুরেরা মাতাল। রাজ্য তাদের হলে তাদের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু যতদিন চাষীরা চাষ করবে, মজুরেরা গতর খাটাবে তত দিন তাদের জীবনের মূল সুর পালটানো শক্ত। সেইজন্যে তাদের জীবনের সুরের সঙ্গে সুর মেলানোর দরকার থেকে যাবে অনেক কাল। সমাজের সব স্তরের জীবন একাকার হতে ঢের দেরি, সোভিয়েট রাশিয়াতেও! সুতরাং লেখকদের জীবনযাপনের ধারা এক রকম হলে চলবে না। যে যাদের জন্যে লিখবে সে সেই অনুসারে বাঁচবে।

বিনুর সাধ যেত পথে বেরিয়ে পড়তে, সকলের সঙ্গে সব

কিছু হতে। চাষীর সঙ্গে চাষী, মাঝির সঙ্গে মাঝি, কাঠুরের সঙ্গে কাঠুরে, বাউলের সঙ্গে বাউল। এদের মধ্যে চাষীর উপরেই ছিল তার পক্ষপাত টলস্টয়ের প্রভাবে। চাষী কিনা অক্ষয় বট, মাটিতে তার শিকড়। সকলের উচ্ছেদ হলেও চাষীর হবে না। চাষীর সঙ্গে চাষী হলে, চাষানী বিয়ে করলে, মাটির প্রাণরহস্য আয়ত্ত করতে পারবে বিনু। যে সব উপলব্ধি এলিমেণ্টাল, অর্থাৎ আদিতন, মৌল, সেসব যদি কোথাও সম্ভব তো কৃষকের জীবনে। বিশেষ করে চাষীর কথা ভাবলেও সাধারণভাবে 'পীপ্‌ল'-এর কথা তাকে উন্মনা করত গান্ধী আন্দোলনের পর থেকে। তাজা ভাব ও তাজা ভাষা জনস্রোতে ভাসছে। ঝাঁপ না দিলে তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। পুঁথির ভাষা ও পুঁথিগত ভাবের উপর তার অরুচি এসেছিল।

বাঁচোয়া

জীবনযাপনের ধারা বদলের জন্যে বিনু এক এক সময় অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু যত দিন একা ছিল তত দিন বরং সেটা সম্ভব ছিল, এখন তার জীবন তার একার নয়। এ বড় আশ্চর্য যে তার জীবনের জন্যে জবাবদিহি তার একার, ভাবী কাল তাকে একক বলে ধরে নিয়ে বিচার করবে, অথচ সে তার একার অভিপ্রেত জীবনযাপন করতে গেলে একাধিকের অভিপ্রেত জীবন বিপর্যস্ত হবে। বিপর্যয় বলতে

যে কতখানি বোঝায় ভাবী কাল তা ঠিক বুঝতে পারবে না। যতটুকু অনুমানে বোঝা যায় ততটুকু বুঝবে।

টলস্টয় তাঁর একার অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাধিকের অভিপ্রায় মিলছে না দেখে অর্ধেক জীবন তুষের আগুনে দগ্ধেছেন, মৃত্যু আসন্ন আন্দাজ করে আর ইতস্তত করেননি, একার জীবনযাপনের ধারায় ঝাঁপ দিয়েছেন। তাই মরে যাবার আগে তরে গেছেন। যদি ওটুকু না করতেন তা হলে চিরকালের মতো হেরে যেতেন। গান্ধীজীর মধ্যে ইতস্তত ভাব নেই, তিনি তাঁর অভীষ্টের জন্যে নিজে তো ভুগবেনই, আরো পাঁচ জনকেও ভোগাবেন। ক্রমে তাঁর পরিজন বাড়তে বাড়তে পাঁচ জনের জায়গায় পাঁচ-দশ লাখ হয়েছে, এক দিন হয়তো চল্লিশ কোটি হবে। তাদের সবাইকে টেনে নিয়ে যাবার মতো আত্মার জোর তাঁর আছে, কিন্তু বিনুর অত মনের জোর নেই যে আর পাঁচজনকে নিয়ে সত্যের পরীক্ষা করবে।

বাঁচোয়া এই যে কৃষক শুধু কৃষক নয়, মানুষও বটে। তাই রামায়ণ মহাভারত তাকে আনন্দ জোগায়, যদিও যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কৃষকের সঙ্গে কৃষক হননি, কৃষক-জীবনের সুর শোনেননি, বাজাননি। কয়লার মজুর গয়লা নয়, তবু রাধাকৃষ্ণের লীলা তাকে রসের রসায়নে বৃন্দাবনের গোপগোপীর একজন করে। পদকর্তারাও গলার সঙ্গে গয়লা বনেননি। রসের রসায়নে এক হয়েছেন। এই রকমই চলে আসছে এত কাল। জীবন-যাপনের ধারা বদলানো অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা নমস্য, যাঁরা পারেননি তাঁদের জীবন যে ব্যর্থ

যায়নি তারও নজির আছে। বিনু যদি না পারে তা হলে যে তার রচনা বুর্জোয়াপাঠ্য হবে, প্রোলিটারিয়ানদের আনন্দ দেবে না, এমন নয়। বাঁচোয়া এই যে তারাও তারই মতো মানুষ।

শ্রেণীসাহিত্য

বিনু বরাবর চেয়েছে সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ দেখা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক। রাজারাজড়ার জীবন ঢের হয়েছে, অভিজাতদের জীবন যথেষ্ট হয়েছে, মধ্যবিত্তদের জীবন বলো জীবনের দৈন্য বলো তাও হয়েছে বিস্তর। আরো তো মানুষ আছে, তাদেরও তো রূপ আছে, সুর আছে, সুধা আছে। তাদের পরিচয় না নিলে, সাহিত্যে না দিলে, তারা হয়তো বঞ্চিত হবে না, কেন না পড়ার জন্যে তাদের তাড়া নেই। কিন্তু আমরা তো বঞ্চিত হব, আমরা যারা পড়তে শিখেছি, পড়ে শিখি। আমাদের লেখকরা কেন আমাদের বঞ্চিত করে রাখবেন ? কেনই বা সমগ্র জীবনের স্বাদ পাবেন না, পাওয়াবেন না ? রামায়ণ মহাভারতের যুগে না হয় এর একটা কৈফিয়ৎ ছিল, তখন এত বড় পাঠক সম্প্রদায় ছিল না। এ যুগে তেমন কোনো কৈফিয়ৎ আছে কি ?

নেই। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, লেখকদের জীবন-যাপনের ধারা সংকীর্ণ ও শুষ্ক। বিনুরই মতো তাঁদের অনেকের সাধ আছে, সাধ্য নেই। টলস্টয় এ যুগের লেখকদের প্রতিভূ। তাঁর শক্তি ছিল বলে তিনি শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিতে পারলেন, সেটাও একটা প্রতীক।

তা হলে উপায় কী? উপায় হচ্ছে গোর্কীর মতো শত শত লেখকের জন্ম। যত দিন তাঁরা জন্মাননি তত দিন কৃষক শ্রমিকের জীবন সাহিত্যের বাইরে থেকে যাবে, ভিতরে আসবে না। আসবে কেবল একটা মেঠো সুর হাওয়ার সঙ্গে ভেসে, মিঠে সুর লোকসাহিত্যের জানালা দিয়ে। খিড়কি দিয়ে ঢুকবে একটা বিদ্রোহের সুর, ভাঙনের সুর। এটা সংবাদ-সাহিত্যের সামিল। কারণ, এর মধ্যে আছে প্রচারের ভাব। লোকসাহিত্যের জানালা, সংবাদ-সাহিত্যের খিড়কি, আসল সাহিত্যের সদর দরজা নয়। সে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছেন খ্যাতনামাদের মধ্যে গোর্কী। অখ্যাতনামাদের মধ্যে আরো কয়েক জন।

গোর্কীর সৃষ্টি কি শ্রেণীসাহিত্য? পরে যাঁরা আসবেন তাঁদের সৃষ্টি কি শ্রেণীসাহিত্য হবে? না, সাহিত্য চিরদিন সাহিত্য, চিত্র চিরদিন চিত্র, সঙ্গীত চিরদিন সঙ্গীত, আর্ট চিরদিন আর্ট। আর্টের জহুরীরা যেখানে সোনার দাগ দেখবেন সেখানে বলবেন, খাঁটি সোনা। অন্যত্র মেকি সোনা। সোনার আর কোনো শ্রেণী নেই।

উপায়ান্তর

গোর্কীর মতো শত শত সাহিত্যিকের জন্যে যাঁরা অপেক্ষা করতে রাজী নন তাঁদের একজনের নাম বিনু। বিনু বরাবর ভেবে এসেছে, অপর কোনো উপায় আছে কি-না। তার মনে হয়েছে, আছে। লোকসাহিত্যের জানালাগুলো কেটে

দরজা বসালে সাহিত্যের ঘর আলো বাতাসে ভরে যায়, লোকসাহিত্যের একটু আধটু পরিবর্তন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্য। সাহিত্যের ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজির। ফাউস্ট ছিল লোকসাহিত্য। গ্যয়টে তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করলেন। গ্যয়টের আগে মার্লো। বাউলদেরর গান ঠিক লোকসাহিত্য না হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন। ওরা নিজেরা পারেনি। বৈষ্ণব কবিতার কুলজি ঘাঁটলে রাখাল-রাখালীদের পূর্ব্ব প্রচলিত গীতি উদ্ধার হবে। সেসব হারামণি হারিয়েই যেত, যদি না বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হয়ে পদকর্তাদের জপমালায় যোজিত হতো। মাঝি-মাল্লাদের ভাটিয়ালী যদি শক্তি-সাধনার অঙ্গ হয়ে থাকত তা হলে আমরা পেয়ে থাকতুম আরো এক সার রত্ন। লোকসাহিত্য হিসাবে নয়, আসল সাহিত্য হিসাবে।

পরবর্তী বয়সে বিনু নিজে যত্নবান হয়েছে। সময় পায়নি, যদি কোনো দিন পায় তো দৃষ্টান্ত দেখাবে। কেন যে এ কালের কবিদের দৃষ্টি এ দিকে পড়ে না বিনু ভেবে পায় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভিৎ ব্যক্তিবিশেষের মানসে নয়, গোষ্ঠী বা জাতিবিশেষের চেতনায়। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সৃষ্টি করবার, কিন্তু ভিৎ যার মৃত্তিকাভেদী নয়, চূড়া তার অভ্রভেদী হলেও পতন তার অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণব কবিতা এত দিন মাথা তুলে খাড়া আছে কেন, সেই বৈষ্ণবদেরই আরো অনেক কাব্য কেন চিৎপাত হয়েছে? এর উত্তর পদাবলী সারা দেশের সমসাময়িক চেতনার ভিত্তি স্বীকার

করে নিয়ে তার উপর নির্মিত হয়েছে। কাব্যগুলি তেমন নয়। আমাদের আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি আধুনিক লোক-গাথার সম্পর্ক থাকত তা হলে আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ থাকত। আর লোকগাথাও সেই সূত্রে অমর হতো। সাহিত্যেও আমরা পেতুম লোকসাহিত্যের প্রাণরহস্য।

জীবনবেদ

রামায়ণ মহাভারত শিশুবয়স থেকে বিনুর প্রিয়। এ কালে কেন কেউ এপিক লেখে না, এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে তার মনে উদয় হতো। এ কালে ব্যাস নেই, বাল্মীকি নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো রয়েছেন, রয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। ভারতবর্ষে ঋষির অভাব কবে ঘটল ? এই এক শতাব্দীর মধ্যে রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহাযোগী, পরমহংস, অংশাবতার, পূর্ণাবতার, মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করলেন কত! এক দেবর্ষি ব্যতীত আর সকলেই সমুপস্থিত। দেবর্ষিও আছেন অন্য নামে। নইলে কথায় কথায় দাঙ্গা বাধে কেন ? বাধায় কে ?

প্রশ্নের উত্তর, এপিক কোনো একজন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। রামায়ণকে বাল্মীকি একটা স্থায়ী রূপ দেবার আগে অস্থায়ী রূপ দিয়েছিলেন আরো অনেকে। তাঁদের কেউ চারণ, কেউ ভাট, কেউ কথক, কেউ ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী বা ঠাকুমা দিদিমা। বলতে গেলে রামায়ণ একটা জাতির সৃষ্টি। মহাভারতও তাই। এ কথা বললে বাল্মীকির কি ব্যাসদেবের গৌরব হানি হয় না। না বললে এপিক সৃষ্টির রহস্য

অনধিগম্য থাকে। এ কালে এপিক হয় না, তার কারণ জাতির সৃষ্টি এপিক আকার নিতে অক্ষম। রামায়ণ মহাভারতের মতো তেমন কোনো কাহিনী বা কিম্বদন্তী প্রচলিত নেই। আছে এক কৃষ্ণলীলা। তা এপিকের নয়, লিরিকের বিষয়। তা নিয়ে হাজার হাজার লিরিক রচা হয়েছে!

তা হলে কি এপিকের আশা ছাড়তেই হবে? না, ব্যক্তির পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা করতে হবে। টলস্টয় রাশিয়াকে তাঁর এপিক উপন্যাস 'সমর ও শান্তি' দান করেছেন। রম্যাঁ রলাঁ পশ্চিম ইউরোপকে দিয়েছেন 'জন ক্রিস্টোফার।' এখানিও এপিক উপন্যাস, সঙ্গীতকার বেঠোভেন এর নায়কের মডেল। বিনুর জীবনে 'জন ক্রিস্টোফার' পড়া এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এপিকের লক্ষণ ওতে আছে কি নেই, অত তর্কে কাজ কী? ও যে আধুনিক ইউরোপের, পশ্চিম ইউরোপের, জীবনবেদ। ওর নায়ক যুদ্ধবিগ্রহের বীর নন, জীবনযাপনের বীর। কেমন করে বাঁচতে হয়, বাঁচা উচিত, বেঠোভেনের জীবন তার নিঃশব্দ জবাব। বিনু খুঁজছিল জীবনযাপনের বিভিন্ন ধারা। এ ধারা তাকে অনুপ্রাণিত করল। কিছু কালের জন্যে এ বই হলো তার জীবনবেদ। সেও যদি এমন একখানি বই লিখে যেতে পারত!

দুই বিনু

যারা সংগ্রামবিমুখ, যারা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে, যারা প্রাণকে মূল্য দেয় সত্যের চেয়ে বেশি তাদের ক্ষমা করা

বিনুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল 'জন ক্রিস্টে.ফার' পড়ার পর থেকে। মানুষমাত্রেই হবে বীর, হলোই বা দীনদরিদ্র, হলোই বা শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত। দৈহিক দুর্ব্বলতা কাপুরুষতার অজুহাত হতে পারে না। যে যত রকম অজুহাত দেখায় সে তত বড় কাপুরুষ। সাফল্যের জন্যে ব্যস্ত না হয়ে অন্যায়ের সঙ্গে সংঘাত বাধানোই পৌরুষ।

অথচ তার মধ্যে আর এক বিনু ছিল যে রণছোড়। যে খেলা করতে ভালোবাসে, হাসতে ভোলে না। জীবনটা তার চোখে দ্বন্দ্ব নয়, লীলা। বাল্যকালের বৈষ্ণব প্রভাব এর জন্যে দায়ী। দায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। এককথায় ভারতবর্ষের স্বভাব।

দুই বিনুর দোটানা এক দিনও বিরতি পায়নি, একই মানুষের একই লেখনীমুখে ব্যক্ত হয়েছে। কখনো বীরভাব প্রবল, কখনো সলীল ভাব। কখনো হাসি, কখনো অশ্রু। কখনো ট্র্যাজেডী, কখনো কমেডী। দুই বিনুর রচনা এক নামেই চলে।

এই দোটানা হয়তো থাকত না ইউরোপের সঙ্গে—ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে—অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না পাতালে। দেশ দেখার শখ চিরকাল ছিল, কত লোক দেশ দেখতে যায়, বিনুও যেত। কিন্তু ইউরোপের জীবনকে নিজের জীবনের অঙ্গ করা তো শখ নয়, ওতে বিপদ আছে। ভারতবাসীর ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া জীবনে সংঘাত কোথায়? যা আছে তা বাদ বিসম্বাদ, তা সংঘাত নামের অযোগ্য। আমরা স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখে চাকরি

বা ওকালতি করি। তার পরে করি বাপ-মা'র ইচ্ছায় বিয়ে। তার পরে ছেলেকে পড়াই, চাকরি জুটিয়ে দিই, বিয়ে দিই। আর মেয়েকে দু'পাতা পড়িয়ে বা না পড়িয়ে পাত্রস্থ করি। এর মধ্যে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার ঘাতপ্রতিঘাত কোথায়? ট্র্যাজেডীর বস্তু কই? আধি ব্যাধি আপদ্ বিপদ্ প্রাণহানি বা ধনহানির নাম ট্র্যাজেডী নয়, দুর্ভাগ্য।

বিনু ক্রমে ক্রমে দেশটার উপর চটে গেল। দেশের জীবনযাপনের ধরণ ধারণের উপর। এ দেশের জীবন যদি এই রকম থাকে তবে এ দেশে না হবে এপিক, না ট্র্যাজেডী। অথচ তার ভিতরে আর একটি বিনু ছিল, সে সুরসিক। সে রাগতে জানে না। জানে অনুরাগ ও কেলি।

দায়

বৈষ্ণবদের একটি কবিতায় আছে, আমি ঠেকেছি পীরিতের দায়ে, আমায় যেতেই যে হবে গো। বিনুর জীবনেও এমন একটি দিন এলো যেদিন তাকেও মানতে হলো, আমি ঠেকেছি প্রণয়ের দায়ে, আমায় লিখতেই হবে গো। কেন লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে, কার জন্যে লিখতে হবে, কী লিখতে হবে, এসব পুঁথিপড়া মনগড়া প্রশ্ন এতদিন আসর জুড়ে বসেছিল, দায় যেদিন এলো সেদিন বিদায় নিল অলক্ষ্যে। তাদের জায়গায় বসল, লিখতেই হবে—শুধু এই একটি অনুজ্ঞা।

বিন্নু চেয়ে দেখল তার সামনে অকূল পাথার। পাথার পার হতে হবে, কিন্তু না আছে তরী, না আছে কাণ্ডারী। কেউ তাকে পার করে দেবেন না, দিতে চাইলেও পারবেন না। না রবীন্দ্রনাথ, না টলস্টয়, না রলাঁ। তার একমাত্র ভরসা সে নিজে। আর তার লেখনী।

দূরের মানুষ তাকে চিঠি লিখেছে। দূরত্বের পারাবার পার হয়ে তাকে কাছের মানুষ হতে হবে। কাছের মানুষ হয়ে শান্তি নেই, এক মানুষ হতে হবে। এই তার দায়। দায়ে পড়ে লিখতেই হবে।

বিন্নু তার হৃদয়গ্রন্থি একে একে খুলল। এক দিনে নয়, একাধিক সহস্র দিবসে। তার অজ্ঞাতসারে একখানি গ্রন্থ রচিত হলো, সে গ্রন্থের পাঠিকা মাত্র একজন। অথচ সেই একটিমাত্র পাঠিকার জন্যে লেখকের কী নিদারুণ অধ্যবসায়! নিজের লেখা তার না-পছন্দ হয়। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। আবার লেখে। নিজের বিচারে যদি চলনসই হলো পাঠিকা হয়তো ভুল বুঝলেন, অভিমান করলেন। তখন তাঁকে ঠিক বোঝানোর জন্যে, মন পাবার জন্যে, আবার কাগজ কলম নিয়ে বসতে হয়, ভাবতে ভাবতে রাত ভোর। লেখা যতক্ষণ না নিখুঁত হয়েছে, হৃদয় যতক্ষণ না স্বচ্ছ হয়েছে, রস যতক্ষণ না মুক্ত হয়েছে ততক্ষণ তার ছুটি নেই। বুকের রক্ত জল হয়ে চোখের দুকূল ভাসায়। শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথার্ত দেহমন অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে। এক আধ দিন নয়। দিনের পর দিন। এক-টানা তিন বছর। তখন তো সে জানত না যে শুঁয়োপোকা

মরে প্রজাপতি জন্মায় কত দুঃখে! ঐ তিনটি বছর যেন মৃত্যু ও জন্মান্তর। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় মেটামরফোসিস (metamorphosis)।

বাঁশি

যে মরল সে সাংবাদিক, যে জন্মালো সে সাহিত্যিক। এ যেমন মানুষের বেলা তেমনি লেখনীর বেলা। যেটা গেল সেটা কাঁসি, যেটি এলো সেটি বাঁশি। কখন যে গেল, কখন যে এলো তা ঘড়ি ধরে বলা যায় না। কেউ লক্ষ করেনি।

বাঁশির উদ্দেশ্য সঙ্গীতসৃষ্টি নয়, অন্তরের পরিচয়দান। কিন্তু পরিচয় দিতে দিতে সঙ্গীতসৃষ্টিও হয়ে যায়। যার অন্তরে রস জমেছে তার বাঁশিতে রসের মুক্তি ঘটলে সঙ্গীত সৃষ্ট হয়। বিনুর লেখনী তার বাঁশি। তাই দিয়ে সে অন্তরাত্মার পরিচয় দান করত, পরিচয় দিতে দিতে সাহিত্য সৃষ্টি করত। কখনো অজ্ঞাতে, কখনো সজ্ঞানে।

তখনো তার ভবিষ্যৎ তার কাছে পরিস্ফুট হয়নি। তখনো সে সাংবাদিক-বৃত্তির স্বপ্ন দেখছে, যদিও তাতে আর সুখ পাচ্ছে না। সাহিত্যিক-বৃত্তি সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। শুনেছে মাসিকপত্রে লেখা পাঠিয়ে ও মাঝে মাঝে বই ছাপিয়ে কোনো কোনো সাহিত্যিক সংসার চালান। কিন্তু নিজের উপর তার এতটা বিশ্বাস ছিল না যে সেও ঘরে বসে লেখার উপস্বত্বে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। মূলধন থাকলে সে তার নিজের সাপ্তাহিক বা মাসিক বার করত। পরের চাকরি করত

না। কিন্তু তা যখন নেই তখন যত দিন না তার পুঁজি জুটছে তত দিন কোনো সংবাদপত্রের বা সাহিত্যপত্রের আপিসে চাকরি করতে বাধ্য। এটার নাম সাংবাদিকবৃত্তি। সাহিত্যিক-বৃত্তি কি এর সঙ্গে বেখাপ? চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কি সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক নন? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক নন? বিনুও প্রথমে চারুবাবুর মতো চাকুরে ও পরে রামানন্দবাবুর মতো স্বাধীন হবে।

লেখনীকে জীবিকার উপায় করতে তার অন্তরের বাধা ছিল। তার মধ্যে যে বীর জেগেছিল সে তো প্রস্তাব শুনে আগুন। জীবিকার জন্যে আর যাই করো, মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ। তার পাঠিকাও বলতেন সেই কথা। যাও, সৈনিক হও, ডাক্তার হও, কর্মী হও। কিন্তু পেটের দায়ে লেখক! ছি! লেখনী যে বাঁশি। বাঁশি বাজিয়ে প্রেম করা যায় পয়সা? ছি! বিনুর ভিতরে যে রসিক জাগছিল সে বিকার বোধ করল ও প্রস্তাবে। প্রস্তাবটা তা হলে কার? শুঁয়ো-পোকার। তাতে আপত্তি কার? প্রজাপতির।

নীতিবিচার

লিখে দু'পয়সা রোজগার করা কি অন্যায়? কই, কেউ তো ও কথা বলে না আজকাল। তখনকার দিনে কিন্তু অনেকে বলত। বিনু যে বংশের ছেলে সে বংশে কেউ কোনো দিন বীর্য বিক্রয় করেননি, অর্থাৎ বর পণ নেননি। চাকরি করাকে তাঁরা আত্মবিক্রয় মনে করতেন। চাকরি করার রেওয়াজ

শুরু করলেন বিনুর বাবা, এর জন্যে তাঁর গ্লানির অবধি ছিল না। বিদ্যা বিক্রয়ের উপরে তখনো দেশের লোকের ধিক্কার ছিল। সুতরাং রচনা বিক্রয় যে নিন্দনীয় হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? লেখনী যে বাঁশি এ বোধ যত দিন ছিল না তত দিন বিনুর জীবিকা সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ ছিল না। কিন্তু সাংবাদিক থেকে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসার ঢেউ উঠতে থাকল।

বিনুর সেসব চিঠি যদি কোনো দিন ছাপা হয় তবে হয়তো সাহিত্য বলে গণ্য হবে, হয়তো সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা দাম দিয়ে সেই বই কিনবেন, হয়তো সেই বই হবে তার আয়ের আকর। কিন্তু লজ্জা করবে না সে আয় স্পর্শ করতে? বিনু কি কখনো সেসব লিখত যদি জানত যে টাকার জন্যে লিখছে, লিখলে এক দিন না একদিন টাকা হবে? ছি ছি ছি! এক জন পাঠিকার জন্যে প্রেমের দায়ে যা লিখেছে তাতে যদি কেউ কোনো দিন পেটের দায় আরোপ করে তবে বিনু বরং মরবে, তবু প্রকাশ করবে না। করতে দেবে না।

একজন পাঠিকার সঙ্গে এক লাখ পাঠক-পাঠিকার তফাতটা কী? কবি যা লেখে তা আপাতত একজনের জন্যে লিখলেও আখেরে সকলের জন্যে লেখে। আপাতত এক দেশের জন্যে লিখলেও আখেরে সব দেশের জন্যে। আপাতত স্বকালের জন্যে লিখলেও আখেরে সব কালের জন্যে। লেখা হচ্ছে ভালোবাসার ধন, প্রাণের জিনিস। যে লেখে সে জানে যে প্রেমের দায় না থাকলে লিখে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই।

প্রেমের দায় ব্যতীত অন্য কোনো দায় থাকলে লেখার মর্যাদা নেই। সেইজন্যে লিখে দু'পয়সা উপার্জন করাটা একটা গৌরবের কথা নয়। বিনা মূল্যে দিতে পারছিনে বলে মাথা তুলতে পারছিনে। কী করি, আমারও তো অন্নচিন্তা আছে। সমাজ যদি সে ভার নিত আমি কেন আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে লেখার দাম নিতুম? আমার প্রিয়জন আমার সব পাঠক-পাঠিকা। বিনু ভাবে।

নেশা ও পেশা

শুঁয়োপোকার নীতি ও প্রজাপতির নীতি এক নয়। প্রজাপতির নীতি উচ্চ স্তরের। সাংবাদিক তাঁর নেশাকে পেশা করতে পারেন অকুতোভয়ে, কিন্তু সাহিত্যিক তাঁর নেশাকে পেশা করতে গেলে পদে পদে ভয় পান। যে কোনো দিন যে কোনো দুর্মুখ তাঁর নামে রটাতে পারে, সীতার সতীত্ব যেমন সোনার হরিণকে লক্ষ্য করে সোনার লঙ্কায় হারালো এঁর কবিত্বও তেমনি সোনার মোহরকে মোক্ষ করে সোনার বাংলায় হারাবে।

কারো কারো জীবনে তাই ঘটেছে। বিয়ের বাজারের মতো লেখার বাজার বলে একটা বেচাকেনার হাট বসেছে। সেখানে লেখকের ও পাঠকের ভিড়। ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে সেখানে যদি কোনো প্রতিভাবান আসেন তবে তিনি লাভবান হতে ইচ্ছা করেন। তখন তিনি যা লেখেন তা দান নয়,

ইনভেস্টমেণ্ট। একজন ভাগ্যবান পুরুষকে মন্তব্য করতে শোনা গেছে, আমার এক একখানা বই হচ্ছে এক একখানা জমিদারি। আমার জমিদারি মারে কে!

বিনুর বরাত ভালো, তখনকার দিনে এই ব্যবসাদারি বা সওদাগরি ছিল না। থাকলে কী ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝখানে গিয়ে পড়ত সে! দুর্মুখের কথাই ফলত। না, তার এক একখানা বই এক একখানা জমিদারি নয়। এক একটি মালা। প্রিয়জনের পরশ পেলে ধন্য হবে, তার পর ধূলোয় লুটোবে। মাড়িয়ে যাবে যার খুশি সে! মারবে মহাকাল। এর জন্যে তার পাওনা যদি থাকে তো প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি, মালার বদলে মালা। তার বেশি যদি পায় তবে মাথায় করে নেয়, প্রয়োজন আছে। সে তো পার্থিব প্রয়োজনের উর্দ্ধে নয়। কিন্তু সেটা মোক্ষ নয়।

লেখনী যে বাঁশি, বাঁশি যে প্রেমের খেয়াতরী, একজনকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দেয়, এক হৃদয়কে আর এক হৃদয়ের কাছে, লেখনীর এ মর্যাদা অকলঙ্ক থাকলে লেখকেরও মর্যাদা অকলঙ্ক থাকে। সীতার সতীত্বের মতো সাহিত্যের সম্মান স্বর্ণ লঙ্কা থেকে ফিরলেও কালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

বিভ্রাট

বিনু এক রকম ঠিক করে রেখেছিল, কলেজ থেকে বেরিয়েই কোনো একটা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হবে, ক্রমে সম্পাদক, পরে পরিচালক, শেষে মালিক। কিন্তু এত দিন যার

জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে সেই সাংবাদিকতা যে নেশা নয়, পেশামাত্র, এটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো। আর সাহিত্যিকতা যে পেশা নয়, নেশামাত্র, এটাও দিন দিন প্রতীয়মান হলো। সাহিত্যিকতা ভিন্ন অপর কোনো পেশা যদি স্বীকার করতেই হয় তবে সাংবাদিকতা কেন? কোনখানে তার জাদু? দুনিয়ার আর কি কোনো পেশা নেই? স্কুলমাস্টারি, প্রোফেসারি, ওকালতি, কপালে থাকলে ওকালতি থেকে ব্যারিস্টারি?

না, স্কুলমাস্টারি নয়। প্রোফেসারি নয়। পরের ছেলেদের খাঁচায় পুরলে তারাও তো অসুখী হয়। কী করে সে বনের পাখী হয়ে খাঁচার পাখীদের আগলাবে? যদি খাঁচার দ্বার খুলে দিয়ে উড়তে শেখায় তা হলে কি তাদের অভিভাবকেরা তাকে আস্ত রাখবেন? অগত্যা সে নিজেই হয়ে উঠবে চিরকেলে খাঁচার পাখী। তার মুখে বনের বাণী মানাবে না, তার লেখনীর মুখে যৌবনের বাণী, তার বাঁশির মুখে প্রণয়বাণী। তখন সে মস্ত মস্ত থীসিস ফাঁদবে, ডক্টরেট পাবে, স্থবির হবে, কিন্তু চিরতরুণ হবে না, কেলিকুশল হবে না।

না, ওকালতি নয়। ব্যারিস্টারি নয়। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলতে বলতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ভুলে যাবে, সত্য বললেও সত্যের মতো শোনাবে না। রিয়ালিটির সহজজ্ঞান হারিয়ে রিয়ালিস্ট হবে, সত্যাসত্যবোধ হারিয়ে বাস্তববাদী। বস্তু-তান্ত্রিকদের সে ভয় করত।

একজনের ইচ্ছা সে সৈনিক হয়। তার মানে তখনকার দিনে স্যাণ্ডহার্স্টে যাওয়া। খরচ যোগাবে কে? আর ডাক্তার

যদিও আধুনিকাদের চোখে প্রায় সৈনিকের মতনই রোমান্টিক তবু বিনুর রোমান্সের ধারণা অমন মেয়েলি ছিল না। বাকি থাকে কর্মী। হাঁ, কর্মী হতে সে রাজী ছিল। কিন্তু কর্মটা কি জুতো সেলাই, না চণ্ডীপাঠ, না মাঝামাঝি একটা কিছু? এর উত্তরে জানতে পেয়েছিল, রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী হলে তো আর একজনের ভার বইতে পারবে না। ভারবাহীদের জন্যে তেমন কর্ম নয়। চাষের আইডিয়া সে টলস্টয়ের কাছে শিখেছিল। চাষ করতে বেরিয়েছিলেন তার বন্ধুশ্রেষ্ঠ। চাষই হয়তো সে করত। তার ফলে তার সাহিত্য প্রাণপূর্ণ ও মহান হতো। কিন্তু—

অন্তঃস্রোত

বিনুর অন্তরে আর একটা স্রোত ছিল, সেটা তাকে অনবরত ইউরোপের দিকে টানছিল, যেমন করে টানে সমুদ্রের অন্তঃস্রোত। আমেরিকা যাওয়া ঘটল না, আমেরিকার স্থান নিয়েছিল ইউরোপ। ইউরোপে যাবার দ্বিতীয় কোনো উপায় না দেখে সে এক এক বার ভাবত সিভিল সার্ভিসের প্রতি-যোগিতায় নামলে কেমন হয়। কিন্তু ভাবনা বাধা পেতো দুটি বদ্ধমূল সংস্কারে। একটি, চাকরির প্রতি বিরাগ। আর একটি, সরকারী চাকরির প্রতি। একে চাকরি, তায় সরকারী চাকরি। গ্লানির উপর গ্লানি।

বিনুর তো প্রবৃত্তি ছিল না গ্লানির ভরা পূর্ণ করতে। ছিল না আর এক জনেরও। কিন্তু দয়িতার দায়িত্ব যার দায়িত্ব পালনের

দুর্ভাবনা তো তারই। রত্নাকরকে দস্যুতা করতে হয়েছিল পারিবারিক দুর্ভাবনায়। পরে আবার তিনিই বাল্মীকি মুনি হলেন। তাঁর পূর্ব পরিচয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল তপস্যার তুষানলে। বিনুরও তাই হতে পারে। তবে দ্বিধা কিসের ?

দুর্ভাবনার তাপে প্রথমে গলল প্রথমোক্ত সংস্কার। এটা আগে থাকতে অনেকটা গলেছিল। বাকিটুকু গলতে সময় নিল না। তার পরে গলল দ্বিতীয়োক্ত সংস্কার। চাকরিই করতে হলো যদি, তবে সরকারী চাকরি কেন নয়? উট গিলবে, মশা গিলবে না কেন ? কিন্তু যুগটা অসহযোগের। বিনুর উপর তার প্রভাব পড়েছিল। তার মনে হতো সরকারী চাকরি এক প্রকার দেশদ্রোহিতা। এমন কি, কলেজে পড়া সম্বন্ধেও তার সেই রকম একটা অপরাধবোধ ছিল।

সেইজন্যে বিনুর পক্ষে মনঃস্থির করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হতো, যদি না তাকে তলে তলে আকর্ষণ করত ইউরোপ। কলেজের গ্লানি ধৌত করেছিল যে অন্তঃস্রোত সরকারী চাকরির গ্লানিও ধৌত করবার প্রতিশ্রুতি দিল সেই স্রোতই। ইউরোপের আহ্বান তার চরণে টান দিল। কানে কানে বলল, বেশি দিনের জন্যে নয়। বাল্মীকির জীবন মনে থাকে যেন। রত্নাকরের ওপার থেকে ফিরে তুমিও তোমার রত্নাকরত্ব বিসর্জন দিতে পারো।

বিনু বিশ্বাস করল। তখন ছিল বিশ্বাস করবার বয়স। সংসারের কতটুকুই বা জানত! যারা জানত তারা বলত, অভিমন্যুর মতো যারা ঢোকে তারা বেরোয় না, এমনি সুরক্ষিত

ব্যূহ। বিনু রাগ করত। সে যে বিনু, সে যে বিষয়বিমুখ। তাকে ধরে রাখবে কোন্ ব্যূহ! তার প্রয়োজনই বা কতটুকু! আর একজন তো এক দিন স্বাবলম্বী হবে। নিজের ভার নিজে বইবে। তারপর?

পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে জীবিকার চেষ্টা করতে হয়, এ কথা যেমন কীটপতঙ্গের বেলায় তেমনি পশুপাখীর বেলায় তেমনি অধিকাংশ মানুষের বেলায় সত্য। অধিকাংশ মানুষ বলছি এইজন্যে যে, এক শ্রেণীর মানুষ পরের পরিশ্রমের উপস্বত্বভোগী। জীবিকার জন্যে তাদের ভাবতে হয় না, যা ভাববার তা পিতামহেরা ভেবে রেখেছেন। তাঁদের কেউ ডাকাতি করে জমিদারি ফেঁদেছেন, কেউ ডাকু-জমিদারকে পরকালের পাথেয় দিয়ে নিষ্কর জমি পেয়েছেন, কেউ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে ও দুর্ভিক্ষের সময় সাতগুণ দামে ধানচাল বেচে লক্ষ টাকার যক্ষ হয়েছেন, কেউ দু'হাতে ঘুষ লুটে সাত পুরুষের সেবাপূজার জন্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করেছেন। বংশধরেরা জীবিকার জন্যে হাড় ভাঙা খাটুনি খাটে না, তবে পরের ঘাড় ভাঙা খাটুনি খাটে বই-কি। মামলা-মোকদ্দমা, আদায়-উশুল, হিসাব-কিতাব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে দেখলে মনে হয় এরাও জীবিকার জন্যে আজীবন পরিশ্রম করছে।

জীবিকার বাইরে বা জীবিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনের

কতটুকু বাকি থাকে? যেটুকু থাকে সেটুকু অবশ্য অকিঞ্চিৎকর নয়, অমূল্য। কিন্তু বিনুর তাতে সন্তোষ নেই। সে চায় আরো, আরো, আরো জীবন। আরো যৌবন। আরো অবসর। আরো খেলা। আরো সাধনা। আরো বেদনা। আরো সৃষ্টি। আরো অমৃত। এক কথায়, জীবিকার ভাগ পনেরো আনা নয়, চার আনা। জীবনের ভাগ এক আনা নয়, বারো আনা। জীবিকাকে একেবারে বাদ দিতে চায় না, বাদ দেবার উপায় নেই যে। কীটপতঙ্গ পশুপাখী সবাই যে নিয়মে বাঁধা তার নাম মর্তের শর্ত। সমাজের ব্যবস্থা যে রকমই হোক না কেন মানুষকে তার অন্ন বস্ত্র ও বাসগৃহের জন্যে জীবনের খানিকটে ত্যাগ করতে হবে।

বিনু এ নিয়ম স্বীকার না করে পারে না। কিন্তু এর জন্যে সে লজ্জিত। মানুষমাত্রেই লজ্জিত। বোধ হয় প্রাণী-মাত্রেই। সান্ত্বনা এই যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে প্রচুর আয়োজন করেছে, আমরা জানিনে বলেই এত কষ্ট পাই ও দিই। ভবিষ্যতে জানব। তখন জীবিকার ভাগ কমবে, জীবনের ভাগ বাড়বে। তখন মর্তের শর্ত এত কঠোর মালুম হবে না।

ব্যবস্থা

সমাজের ব্যবস্থা যুগে যুগে বদলেছে, ভবিষ্যতেও বদলাবে। বদলানো উচিত। নইলে মর্তের শর্ত অধিকাংশের অসহ্য হবে। বিনু বরাবর পরিবর্তনের পক্ষে। যারা পরিবর্তনের বিপক্ষে বিনু তাদের বিপক্ষে।

কিন্তু বিনুর দৃষ্টি রাহুর উপরে নয়, চাঁদের উপরে। জীবিকার উপরে নয়, জীবনের উপরে। সমাজের নতুন ব্যবস্থা যদি শুধুমাত্র নতুন হয় তবে তার নতুনত্ব অচিরেই পুরাতন হবে। নতুন ব্যবস্থা চাই, সেই সঙ্গে এও চাই যে, সে ব্যবস্থা সত্যিকারের ভালো ব্যবস্থা হবে। ভালো ব্যবস্থার কথা বিনু তখন থেকে ভাবছে। বলা বাহুল্য, ভালো ব্যবস্থা বলতে নতুন ব্যবস্থাও বোঝায়।

ভালো ব্যবস্থার ভালোটুকু মেপে দেখতে হবে জীবনের মাপকাটিতে। যারা বলে, জীবিকার মাপকাটিতে, তাদের সঙ্গে বিনুর গোড়ায় অমিল। জীবিকা যে জীবনের অনেক-খানি বিনু তা বোঝে ও মানে। রাহু যে চাঁদের অনেকখানি চন্দ্রগ্রহণের সময় এ কথা না মেনে নিস্তার নেই। তা বলে রাহুকে বাহু বাড়িয়ে বন্দনা করা চলে না। তোমরা জীবিকার ধরন ধারণ বদলে দিতে চাও। বেশ তো। কিন্তু জীবিকার ভাগটা কি কমবে তাতে? জীবনের ভাগ কি বাড়বে? হয়তো জীবিকার ভাগ কমবে। কিন্তু কেবল ভাগ কমলে কী হবে, যদি গুণ না কমে? যদি প্রতিপত্তি না কমে? যদি মানুষের পরিচয় দেওয়া ও নেওয়া হয় শ্রমিক বা কিষাণ বলে? মানুষ যখন ষোলো ঘণ্টা খাটত ও আট ঘণ্টা বাঁচত তখন তাকে শ্রমিক বা কিষাণ বললে বেমানান হতো না। যখন চার ঘণ্টা খাটবে ও বিশ ঘণ্টা বাঁচবে তখনো কি সে তার জীবিকার দ্বারা চিহ্নিত হবে? তাই যদি হলো তবে রাহুই জিতল, চাঁদ হারল।

তার পরে আরো এক কথা। জীবিকার সময়টাও জীবনেরই অংশ। আয়ুর সামিল। যখন পেটের দায়ে কাজ করছি তখনো যেন মনে করতে পারি যে প্রাণের আনন্দে বাঁচছি। নইলে জীবনের অখণ্ডতার স্বাদ পাব না। জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করলে জীবিকার ভাগ যত কম হোক না কেন অখণ্ডতার ক্ষতিপূরণ হয় না। বিনু এটা মর্মে মর্মে বুঝেছে। জীবিকাকে জীবন্ত না করতে পারলে মানুষের জীবন অখণ্ড হবে না।

ধর্ম

জীবিকাকে জীবন্ত করে ধর্ম। জীবিকাতে জীবন্ন্যাস করে ধর্মবিশ্বাস। নইলে মানুষ অখণ্ড জীবনের স্বাদ না পেয়ে মরমে মরে। সে মরণ নরক সমান। তাই তার ইতিহাসে এত বার ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনো ঘটেছে। সাম্যবাদ গত শতাব্দীতে ধর্মরূপেই গৃহীত হয়েছিল বহু ব্যক্তির জীবনে। এখনো হচ্ছে। তবে এখন তার কর্মকাণ্ড ধর্মের জায়গা জুড়েছে।

জাতীয়তাবাদও একপ্রকার ধর্ম। বিশেষত যে দেশ স্বাধীন হতে চেষ্টা করছে সে দেশে। অথবা স্বাধীনতা রাখতে চেষ্টা করছে সে দেশে। তা যদি না হতো কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে যোগ দিত না, বিদ্রোহ করত। রুশ দেশেও জাতীয়তাবাদ এখনও সতেজ। যারা সাম্যবাদী তারা জাতীয়তা-বাদীও। এক সঙ্গে একাধিক ধর্মে বিশ্বাস মানবচরিত্রের

এক দুজ্ঞেয় রহস্য। এ দেশেও আমরা শাক্ত বৈষ্ণবের সমন্বয় দেখেছি। এমন কথাও শুনেছি যে, যাঁর নাম শ্যামা তাঁরই নাম শ্যাম। যার নাম অসি তারই নাম বাঁশি। আমরা জাতকে-জাত সমন্বয়বাদী। এক দিন এমন কথাও শুনব যে যাঁর নাম কৃষ্ট তাঁরই নাম খ্রীষ্ট, যার নাম বাইবেল তারই নাম বেদ।

বিনু কোনো দিন মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী হতে পারল না, সাম্যবাদীও না। বাদীদের সঙ্গে তার বিবাদ বেধে যায়। কিন্তু তারও একটা ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল, এখনো রয়েছে। ধর্মের কাজ জীবনকে অখণ্ডতা দেওয়া। কেবল দৈনন্দিন জীবনকে নয়। সমগ্র জীবনকে। সমগ্র জীবন বলতে কি শুধু ইহকালের জীবন বোঝায়? পরকালের জীবন কি নেই? যদি থাকে তবে ইহপরকালব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার জীবন যার দ্বারা ধৃত হয়েছে তারই নাম ধর্ম। ধর্ম ব্যক্তিকে নিবিড় করে বেঁধেছে সমষ্টির সঙ্গে, কিন্তু বাঁধনটা বিধিনিষেধের নয়, স্বার্থের বা সুবিধার নয়, অবিভক্ত জীবনের। সেও একটি অখণ্ড বৃত্ত, আমরা তার এক একটি বিন্দু।

ধর্মই বলো, প্রেমই বলো, তার সার হচ্ছে ঐক্যবোধ। মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ, মানুষে পশুতে পাখীতে বনস্পতিতে ঐক্যবোধ, প্রাণীতে বস্তুতে ঐক্যবোধ, বস্তুতে শক্তিতে ঐক্যবোধ, শক্তিতে সত্তায় ঐক্যবোধ। এ শৃঙ্খল কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! শেষ একটা কথার কথা, যেন আরম্ভ একটা কথার কথা। আদিও নেই, অন্তও নেই। বিনু অনুভব করে।

লিখব না বাঁচব

লেখাটাকে জীবিকা করলে এ প্রশ্ন উঠত কি না বলা শক্ত। কিন্তু অন্য এক জীবিকা মনোনয়ন করে বিনু পড়ল ফাঁপরে। জীবিকাকে জীবনের বড় অংশ দিয়ে বাকি যেটুকু থাকে সেটুকু যদি লিখে কাবার করে তবে বাঁচবে কখন? যদি বাঁচে তবে লিখবে কখন?

লেখা ও বাঁচার এই দোটানা এখনো মেটেনি। দু' পৃষ্ঠা লিখতে না লিখতে তার মনে পড়ে যায়, ঐ যা! বাঁচতে ভুলে গেছি। আজকের দিনটা ঠিকমতো বাঁচা হলো না। আবার, দু'দিন লেখা বন্ধ থাকলে তার মন কেমন করে। কই, কিছুই তো লিখে যেতে পারলুম না। যা লিখতে চাই তার তুলনায় যা লিখেছি তা কতটুকু, তা কত অসার! ওটুকু লেখা ক'দিন টিকবে!

বিনু এক বার ভাবে, জীবনটা ব্যর্থ গেল। এক বার ভাবে, লেখনীটা অক্ষম। তার পর ভাবে এখনো সময় আছে। যদি ঠিকমতো বাঁচতে পারি তো ঠিকমতো লিখতে পারব। বাঁচাটাই আগে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? জীবিকা ও জীবন মিলে অখণ্ড নয় যে। ধর্ম সাহায্য করছে না। যেখানে অখণ্ড জীবনের স্বাদ নেই সেখানে আগে বাঁচলে কী হবে? সে বাঁচা কি ঠিকমতো বাঁচা? তার থেকে যা আসবে তা কি ঠিকমতো লেখা?

অথচ জীবিকাকে ছেঁটে বাদ দেবার উপায় নেই। এ জীবিকা না হয়ে আর কোনো জীবিকা হলে তফাৎ যা হতো তা উনিশ বিশ। একমাত্র সমাধান সাহিত্যকে জীবিকা করা। বিনু এ কথা অনেকবার ভেবেছে। কিন্তু জীবিকার জন্যে সাহিত্য লিখতে বসলে এত বেশি লিখতে হয় যে বিনু কোনো কালে এত বেশি লিখতে চায়নি, এত বেশি লিখলে বেশির ভাগ লেখা হবে অনিচ্ছায় লেখা। অনিচ্ছায় লেখা কদাচ ভালো হয়। বাজে লেখায় হাত খারাপ করলে সে হাত দিয়ে পরে ভালো লেখা বেরোয় না। প্রকৃতির প্রতিশোধ।

সুতরাং জীবিকার জন্যে আর যাই করো, মা লিখ, মা লিখ। যদিও পরম শ্রদ্ধাস্পদ যামিনী রায় বলেন আর্টকে জীবিকা না না করলে ভালো আর্ট হয় না।

আপনাকে চেনা

বিনু আপনাকে চিনল প্রেমিকার চোখে। চিনল, সে কবি। আরো চিনল, সে নায়ক। একাধারে কবি ও নায়ক বাল্মীকি ও রাম। যে লেখে ও যাকে নিয়ে লেখা হয়। যে লেখে ও যে বাঁচে।

তার এই যুগ্ম পরিচয় সে একদিনের তরেও ভোলেনি। সেই জন্যে লেখা নিয়ে মাতামাতি করেনি। লেখা নিয়ে মশগুল থাকলে যাকে নিয়ে লেখা হয় তার কথা মনে থাকে না। বিনু তাকে মনে রেখেছে, তাই বাঁচার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। যে বাঁচতে জানে সে যদি কবি হয়ে থাকে তো

লিখতে জানে। যদি কবি না হয়ে থাকে তো তাকে নিয়ে আর কেউ লিখবে। যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন যে বাঁচে সে ঠকে না। যে বাঁচে না সে হাজার লিখলেও ঠকে। তার লেখা বাঁচে না, পাঠক পাঠিকাদের বাঁচায় না। তাতে জীবনের স্বাদ নেই।

পরবর্তী বয়সে বিনু উপলব্ধি করেছে যে, বাঁচাটাও লেখা। কালি-কলম দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে তনু দিয়ে লেখা। লেখা বলতে যদি শুধু লেখনী চালনা বোঝায় তবে তার জন্যে ঢের লোক রয়েছে, লোকের অভাব হবে না কোনো দিন। কিন্তু তারা নায়ক হবে না, তাদের কারো জীবন নিয়ে কাব্য রচা হবে না। যে নায়ক হবে তাকে বাঁচতে হবে নায়কের মতো, লিখতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে প্রেমের তুলিতে। তা যদি না পারে তবে শুধু কাগজ ভরিয়ে কী হবে! কোন্ মোক্ষ লাভ হবে!

বিনু যেমন উপলব্ধি করেছে যে বাঁচাটাও লেখা, তেমনি আরো উপলব্ধি করেছে যে, লেখাটাও বাঁচা। সে যখন তন্ময় হয়ে লেখে তখন তার তন্ময়তা লেখার প্রতি নয়, লক্ষ্যের প্রতি। পাঠিকার প্রতি। পাঠকের প্রতি। যিনি পড়বেন তাঁর প্রতি। দেশ কাল অতিক্রম করে যে অন্তিম পাঠক আছেন, আল্‌টিমেট রীডার (ultimate reader), তাঁর প্রতি। লেখা দিয়ে তাঁর পরশ পাওয়াও বাঁচা। লিখতে লিখতে অনেক সময় মনে হয়েছে সৃষ্টিরহস্য আমার নখদর্পণে। সৃষ্টি করেই বুঝতে পারি সৃষ্টির অর্থ কী। জ্ঞান দিয়ে যাঁকে পাওয়া যায় না, ধ্যান

দিয়েও না, সৃজন দিয়ে তাঁর সঙ্গ পাই। কারণ সৃজন হচ্ছে আত্মদান। আপনাকে দেওয়া।

লেখাটাও বাঁচা, যদি লক্ষ্যের প্রতি শরবৎ তন্ময় হতে পারি। উপলক্ষ্যের প্রতি নয়। লেখাটা উপলক্ষ্য, যিনি পড়বেন তিনি লক্ষ্য।

ডায়ালেকটিক

এটা হল পরিণত বয়সের সিন্‌থেসিস্। বিন্থর বিশ-একুশ বছর বয়সে এর অস্তিত্ব ছিল না। তখন ছিল থীসিস ও য়্যান্টি থীসিস। থীসিসের নাম, নায়ক। য়্যান্টি থীসিসের নাম, কবি। নায়ক মানে যে বাঁচে। কবি মানে যে লেখে। নায়ক, যেমন রাম। কবি, যেমন বাল্মীকি। প্রকাশ থাকে যে, বিন্থর জীবনের আদর্শ রাম নন, কবিত্বের আদর্শ বাল্মীকি নন।

বিন্থর বয়স্যেরা পরিহাস করে বলতেন, ডায়ালেকটিকল রোমান্টিসিজম। বিন্থ বলত নামে কী আসে যায়! গোলাপকে যে নামেই ডাকো সে তেমনি সৌরভ বিলায়। কিন্তু তার ভালো লাগত এ কথা ভাবতে যে সে রোমান্টিক। পীত বর্ণের পাঞ্জাবি পরে কলেজে যেত। পীতবসন বনমালী। পাঞ্জাবির নীচে রক্তরাঙা গেঞ্জি। ও তার বুকের রক্ত! তার কথাবার্তার ভাষা ছিল সুভাষিতবহুল। এক একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, আর বন্ধুরা ঠাওরাত বিন্থ মুখস্থ করে এসেছে। হেসে উড়িয়ে দিত।

তখনকার দিনে তার মস্ত ক্ষোভ ছিল যে কেউ তাকে ঠিকমতো বুঝল না। যে দু'-একজন বুঝতেন তাঁদের সঙ্গে তার

আলাপ প্রধানত পত্রযোগে। চিঠি লিখে সে যেমন নিজেকে বোঝাতে পারত কথা বলে তেমন নয়। এমনি করে সে লেখার দুঃখ বরণ করে। নইলে লিখতে যে তার ফূর্তি লাগত তা নয়। তার ফূর্তি লাগত হাঁটতে, সাঁতার কাটতে, ক্রিকেট খেলতে, তর্ক করতে, বই ঘাঁটতে, এক সঙ্গে পাঁচ-সাতখানা বই পড়তে বা পড়ার ভান করতে, ভিড় দেখলেই ভিড়ে যেতে, তামাসা দেখতে। এমন লোকের উপর ভার পড়ল রাতদিন চিঠি লেখার, কবি হওয়ার। সে যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হবে, ধর্মঘট করবে, তার বিচিত্র কী!

চাইনে লিখতে, শরতের জ্যোৎস্না নষ্ট করতে। যাই, ঘুরে বেড়াই। শীতের সকালটি মিষ্টি লাগছে, লেখা কি তার চেয়ে মিষ্টি! যাই বলো, লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার মতো মিষ্টি কিছু নেই, যদি এক বাটি গরম মুড়ি থাকে হাতের কাছে। এক পেয়ালা গরম চা যদি কেউ দয়া করে দিয়ে যায়। বিনুর স্বভাবটা স্বাপ্নিকের। তার স্বপ্ন যদি সকলের হতো তা হলে হয়তো সে লিখত না। সকাল সন্ধ্যা মাটি করত না।

কিন্তু আর একজনের কথা মনে পড়লেই সে আহারনিদ্রা অবহেলা করে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরাতে বসত, ছিঁড়ত বেশি, পাঠাত কম। তাও কিছু কম নয়।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব

এত দিনে একটা সিন্‌থেসিস হয়েছে, কিন্তু বড় সহজে হয়নি। দুটি গল্প বলব। বিনুর মুখে শুনেছি।

বিনু যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে কলকাতা যায়, তার পিতৃবন্ধু তাকে সম্পাদকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। তিনিই তাকে বলেছিলেন, এটা কি একটা জীবন! আমার গায়ে যদি জোর থাকত আমি জাহাজঘাটে গিয়ে মোট বইতুম। তখন বিনু ঠিক বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি কেন মুটের জীবন শ্রেয়, লেখকের জীবন হেয়।

পরে তার এক বন্ধু কলেজ থেকে বেরিয়ে ডেপুটি হন। তিনিও বিনুর মতো একটু আধটু লিখতেন, দু'জনের লেখা একসঙ্গে ছাপা হতো। তিনি তাকে এক দিন বলেছিলেন, আমি তো ভাই আজকাল সময় পাইনে, ঘোড়ার পিঠে বসে লিখি। বিনুর তখন মনে হলো, এই তো জীবন। ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে ঘোরা। এমনি করে বেদূইনের মতো বাঁচতেই আমার সময় যাবে, লিখতে সময় থাকবে না, তবু যদি লিখতেই হয় তবে ঘোড়ায় চড়ে লিখব।

ঘোড়ায় চড়ে লেখার উপর তার হঠাৎ এত শ্রদ্ধা সঞ্চার হলো যে সে ঘোড়ার অভাবে গাছে চড়ে লিখল। ঘোড়ায় চড়া যত রোমান্টিক গাছে চড়া তত নয়। এ খেয়াল বেশি দিন ছিল না। কিন্তু এই ধরণের খেয়াল আরো কত বার জেগেছে। ঘরে বসে লেখা হচ্ছে নিতান্তই লেখা, আর ঘোড়ায় চড়ে লেখা হচ্ছে লেখা এবং বাঁচা। লেখার চেয়ে বাঁচার ভাগটা প্রধান। লেখার মধ্যে সেই বাঁচার ক্রিয়া চলবে। ফলে লেখাটা হবে প্রাণবান ও বেগবান।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওর মতো কুসংস্কার নেই। এখনো

কিন্তু শোনা যায় যে যুদ্ধের কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন তাজা হয় দূর থেকে তেমন নয়। একজন ইংরেজ সাহিত্যিক নাকি সরাবখানায় বসে নিত্য নিয়মিত লেখেন, সেখানকার হট্টগোলে তাঁর লেখা জীবন পায়। বিনু আর ওসব বিশ্বাস করে না, কিন্তু এক কালে তার মনে হতো ঘরে বসে লেখার মধ্যে একটুও পৌরুষ নেই, বীরত্ব নেই, লিখতে হলে বাইরে গিয়ে জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে হবে। যেন বহির্জীবনটাই জীবন, অন্তর্জীবনটা কিছু নয়।

পৌরুষ

লেখা যে একটা ডিসিপ্লিন বিনু ক্রমে উপলব্ধি করল। সৈনিকের ডিসিপ্লিন এর চেয়ে কঠোর হতে পারে না। সুতরাং লেখকের জীবনও সৈনিকের জীবনের সমতুল্য। তার ঘোড়া নেই, কিন্তু ঘোড়ার দরকারও নেই। তার খোঁড়া চেয়ারটাই তার ঘোড়া। ভোঁতা কলমটাই তার সঙীন।

কিন্তু প্রথম বয়সে তার বিশ্বাস ছিল অন্য রকম। সে বলত দূর! এটা কি পুরুষের কাজ! এই যে আমি দিন রাত লেখা নিয়ে খেলা করছি। হাঁ, হতো বটে পুরুষোচিত, যদি আমার লেখার স্ফুলিঙ্গ থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত একটা দাবানল। সমাজ সংসার ভস্ম হয়ে যেতো। আর সেই ভস্ম থেকে উঠে আসত নতুন সমাজ, নবীন সংসার।

তখনো বিশুদ্ধ আর্টের উপর তার আস্থা জন্মায়নি। আর্টকে সে পুরুষের কাজ বলে মানতে প্রস্তুত হয়নি, যদি না ওর দ্বারা

সামাজিক কার্যসিদ্ধি হয়। তবে কি ওটা অকর্তব্য? না, অকর্তব্য কেন হবে? জগতে কি কেবল পুরুষ আছে, নারী নেই? যে কাজ পুরুষোচিত নয় সে কাজ মহিলাযোগ্য তো বটে। জগতে যেমন ফুলের মালা আছে, মালিনীরা গাঁথে, তেমনি রসের কবিতাও থাকবে, যারা লিখবে তারা একটু যেন মেয়েলি। রবীন্দ্রনাথকেও লোকে তাই বলত। বিনুর একমাত্র পাঠিকা বিনুকেও বলতেন মেয়েলি। বিনুর তাতে শরম্ লাগত না। কারণ মেয়েরা যে দেবী।

তা হলেও বিনুর ঝোঁক চেপেছিল ঘোড়ায় চাপতে, ঘোড়ায় চড়ে লিখতে। পুরুষের কাজ, হয় না-লেখা, নয় ঘোড়ায় চড়ে লেখা। বাকিটা মেয়েদের ও মেয়েলি মেজাজের পুরুষদের। তাঁরা বসে বসে আর্ট সৃষ্টি করুন, আমরা গিয়ে সমাজ ভাঙি গড়ি। আমাদের অন্য কাজ আছে। আমরা পুরুষ।

আর্ট যে যুদ্ধবিগ্রহের মতো পুরুষেরই কাজ, গৃহযুদ্ধের মতো মেয়েদেরও, এ জ্ঞান এলো অভিজ্ঞতার থেকে। এটা পড়ে পাওয়া নয়, ঠেকে শেখা। সেই দারুণ ডিসপ্লিন তিন বছরে বিনুকে ত্রিশ বছর বয়স্ক করেছিল। পরিণত মন নিয়ে সে অন্যান্য সত্যের সঙ্গে এ সত্যও শিখল যে সামাজিক কার্যসিদ্ধি আর্টের উদ্দেশ্য নয়, আর্ট ফর আর্টস্ সেক।

আর্ট ফর আর্টস্ সেক

আর্টের সাধনা যদি প্রেমের সাধনার সঙ্গে তুলনীয় হয় তবে প্রেমের সাধনায় যেমন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখতে নেই আর্টের

সাধনায়ও তেমনি। ফল হয়তো ফলবে, হয়তো ফলবে না, কিন্তু ফলের কথা ভাবলে লাভের চিন্তা জাগে, পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রবল হয়। সেইজন্যে বলা হয়েছে, মা ফলেষু কদাচন। যে সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেননি তিনি যা লাভ করেন তার নাম সিদ্ধি নয়, সিদ্ধাই। আর যিনি সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন তিনি হয়তো সিদ্ধি লাভ করবেন না, কিন্তু কাজ নেই তাঁর সিদ্ধাই নিয়ে। তাঁর সাধনাতেই সুখ। পথ চলাতেই আনন্দ।

যাঁরা কখনো ভালোবেসেছেন তাঁদের বোঝাতে হবে না যে প্রেমের সবটাই দেওয়া। বরাতে থাকলে পাওয়াও ঘটে, কিন্তু যদি না ঘটে তা হলেও প্রেমিকের চিন্তা নেই। প্রেমিক যখন পান তখন আকাশভাঙা অঝোর ধারায় পান। যেমন বেহিসাবী দেওয়া তেমনি বেহিসাবী পাওয়া। কিন্তু যদি নাই পান তা হলেও তিনি খুশি। দু'হাত খালি করে বিলানোই তাঁকে প্রেমিক করেছে। নইলে তিনি হতেন পাটোয়ারী।

প্রেমের মতো আর্টের সবটাই দেওয়া, দু'হাত খালি করে বিলানো। কেউ দু'হাত ভরে ফিরে পান, কেউ তারও বেশি। আবার কারো কপাল মন্দ, যা পান তা সামান্য, হয়তো কিছুই নয়। সেইজন্যে পাওয়ার প্রত্যাশা পুষতে নেই, তাতে অনর্থক দুঃখ। যদি ব্যবসা করতে হয় তো আর্ট ভিন্ন আরো কত কারবার আছে। তাতে জমাখরচের হিসাব রাখা চলে, লাভ লোকসানের অঙ্ক কষা যায়। সেসব ছেড়ে যদি কেউ আর্টের পথে পা দেন তবে তাঁর পথ চলাতেই আনন্দ।

আর্ট ফর আর্ট'স সেক বলতে বিন্নু বোঝে এই তত্ত্ব। যাঁরা আর্টের কাছে কোনো একটা ফল দাবি করেন তাঁরা হয়তো প্রচলিত অর্থে পাটোয়ারী নন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল, দেবত্বের বিকাশ, ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, নৈতিক উন্নয়ন, লোকশিক্ষা প্রভৃতি যত রকম ফল আছে সমস্তই লাভের তুলিকায় লাঞ্ছিত। সে পথে পথ চলার আনন্দ নেই।

উদ্দেশ্য ও উপায়

"The Swami had once asked Pavhari Baba of Gazipur, 'What was the secret of success in work ?' and had been answered, 'To make the end the means, and the means the end." লিখে গেছেন ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথায়।

এ কথা যে-কোনো কর্মের বেলায় সত্য। কলাসৃষ্টিও একটা কর্ম, সুতরাং তার বেলায়ও। উদ্দেশ্যকে উপায় করতে হবে, উপায়কে উদ্দেশ্য, যে-কোনো সাধনায় এই হলো সিদ্ধির গূঢ় মর্ম। আর্টের সাধনাতেও।

সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উপায়। সেইজন্যে বিন্নু বলে, আর্টের খাতিরে আর্ট। আর্টই আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টই আর্টের উপায়। আর্ট যখন লক্ষ্য ভেদ করে তখন আর্টেরই লক্ষ্য ভেদ করে, আর্ট হয়েই তার উত্তীর্ণতা বা উদ্ধার। তখন তাকে সামাজিক মাপকাঠিতে মাপতে পারো, হয়তো তাতেও সে উতরাবে। কিন্তু কেবলমাত্র তাতেই নয়।

আর্টের মানদণ্ড আর্টের ভিতরে। তাই তার সার্থকতা আর্ট হওয়াতে। আর যা-কিছু তা অধিকন্তু। অধিকন্তু ন দোষায়। তাকে দিয়ে যদি সমাজের মঙ্গল বা দেবত্বের বিকাশ হয়, যদি চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়, তবে সেটা অধিকন্তু। তাতে দোষ নেই। কিন্তু আর্টের উদ্দেশ্য সেটা নয়, উপায় তো নয়ই।

গায়ের জোরে সেটাকে সরিয়ে রাখারও দরকার দেখিনে। লেখার মধ্যে যদি সমাজের ভালোমন্দের কথা আসে তো আসুক। ঠেকাতে যাওয়া ভুল। কিন্তু ভুল হয় যখন সমাজের ভালোমন্দকে আর্টের ভালোমন্দ বলে গোলমালে পড়ি। আর্টের ভালোমন্দ যদিও সংসারছাড়া নয়, তবু সাংসারিক ভালোমন্দের সঙ্গে তার সব সময় মেলে না, অনেক সময় সংসারের দিক থেকে যা ভালো, আর্টের দিক থেকে তা মন্দ, আর্টের দিক থেকে যা ভালো, সংসারের দিক থেকে তা মন্দ। তা বলে তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয়। ভালো আর্ট যদি আর সব দিক থেকে ভালো হয় তো সব চেয়ে ভালো। কিন্তু প্রথমে তাকে ভালো আর্ট হতে হবে। অন্তত পক্ষে আর্ট হতে হবে। যা কোনো জন্মে সাহিত্য নয় তাকে সৎসাহিত্য বলা হাস্যকর। যা কোনো কালেই কাব্য নয় তাতে সামাজিক তাৎপর্য থাকলেই কি তা সাম্প্রতিক কাব্য হবে?

কবিত্ব

কবিতার প্রাণ হচ্ছে কবিত্ব। প্রাণ যদি না থাকে তবে সামাজিক তাৎপর্য আছে বলেই তা কবিতা নয়। তা কবিতার

ভান। তাকে দেখতে কবিতার মতো, কিন্তু প্রতিমাকেও তো দেখতে সরস্বতীর মতো।

যেখানে কবিত্ব আছে সেখানে যদি সামাজিক তাৎপর্য থ'কে তবে সেটা অধিকন্তু। তাতে দোষ নেই। কিন্তু তাতে গুণ যা আছে তাও সাময়িক। সমাজের পরিবর্তন হলে তার গুণটুকুর কদর থাকবে না। আদর থাকবে কিন্তু কবিত্বের। কবিত্বকে গুণ না বলে প্রাণ বলাই সঙ্গত।

যেখানে প্রাণ নেই সেখানে প্রাণের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। সেইজন্যে প্রাণেরই আবাহন করতে হয় আগে। আগে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, জীবন্যাস। তার পরে সামাজিক তাৎপর্য বা আধ্যাত্মিক উচ্চতা। কল্পিত বা প্রকৃত গুণ। তারও স্থান আছে। কিন্তু প্রাণের স্থান নিতে পারে না সে। কবিত্বই প্রাণ।

গুণ সম্বন্ধে যা বলা হলো রূপ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। প্রাণের অভাব পূরণ করার সাধ্য রূপেরও নেই। আগে প্রাণ, তার পরে রূপ। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, মিল, এ সকলেরও স্থান আছে, কিন্তু প্রাণের স্থান, কবিত্বের স্থান, যদি এরা দখল করে তো কবিতাই হবে না। যা কবিতাই নয় তাকে আধুনিক কবিতা বললে রূপকেই প্রাণের স্থান দেওয়া হয়। তাতে হয়তো ঠাট বজায় থাকে, কিন্তু পূজোর চার দিন পরে কেউ প্রণাম করে না। প্রাণহীন রূপ যার সম্বল সে নিতান্তই আধুনিক, দু-চার বছর পরে তার আধুনিকতার ইতি।

আঙ্গিক নিয়ে বিনু কোনো দিন মাথা ঘামায়নি, তা বলে

আঙ্গিকের উপর তার অবজ্ঞা নেই। যেমন সামাজিক তাৎপর্যের উপর তার অশ্রদ্ধা নেই। যেটা আগে সেটা হচ্ছে কবিত্ব। ভাগ্যবানরা কবিত্ব নিয়ে জন্মান, বিনু তেমন ভাগ্যবান নয়। তাকে ও জিনিস অর্জন করতে হয়েছে, এবং রক্ষণ করতে। সে যদি প্রেমে না পড়ত কবিত্বের ধার ধারত না, খোঁজ নিত না যে তার অন্তরে কবিত্বের ধারা ফল্গুর মতো বইছে। কবিত্বকে কবিতা করতে হবে। এই তার সাধনা।

রূপচর্চ্চা

কী লিখব, এ কথা তাকে ভাবতে হয়নি, একজন তাকে ভাববার সময় দেননি। সকালের ডাকে চিঠি এসেছে, বিকালের ডাকে—হয়তো এক দিন পরের বিকালে—জবাব গেছে। কিন্তু কেমন করে লিখব, এ প্রশ্ন তাকে প্রত্যহ ভাবতে হয়েছে, সেইজন্যেই চিঠির জবাব গেছে এক দিন দেরিতে।

এটা রূপের প্রশ্ন। লেখা কী করে রূপবান হবে, যা লিখব তাতে কী করে লেখকের রূপ ফুটবে, ভাব কী করে রূপ ধরবে, এসব প্রশ্ন একই প্রশ্নের শাখাপ্রশাখা। বিনু আঙ্গিকের জন্যে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু অনঙ্গকে অঙ্গ দেবার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। আঙ্গিক যদি এর থেকে স্বতন্ত্র হয় তো বিনু তার মহিমা বোঝে না। যদি এর অন্তর্গত হয় তো আঙ্গিকের প্রতি উদাসীন নয় সে। কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস রূপ, সুষমা, সুমিতি, অর্থবোধ, ব্যঞ্জনা। গদ্যই হোক আর

পদ্যই হোক, প্রত্যেক বাক্যের একটা ছন্দ আছে, প্রত্যেক শব্দের একটা ধ্বনি আছে। তার জন্যে কান তৈরি করতে হয়। যেমন বাইরের কান তেমনি ভিতরের কান। তারপর কান যে রায় দেয় সে রায় কলমকে মেনে নিতে হয়।

সঙ্গীতের মতো সাহিত্যের রূপ নয়নগোচর নয়, শ্রুতি-গোচর। চোখ দিয়ে নয়, কান দিয়ে দেখবার। পদ্যের ছন্দ যে গীতধর্মী সকলে তা মানবেন, কিন্তু গদ্যেরও এক রকম ছন্দ আছে। যারা জানে তারা মানে। অতি সাধারণ আটপৌরে গদ্য তার প্রচ্ছন্ন ছন্দের লীলায় সঙ্গীতের মতো লাগে। ইংলণ্ডে ইংরেজের মুখের কথাবার্তা বিনুর কানে গানের রেশ আনত। বিনু তাই গদ্যকে পদ্যের মতো ভালোবেসেছে। কিন্তু গদ্যকে পদ্যের মতো করে সাজিয়ে পদ্য বলে চালাতে চায়নি। গদ্যের ছন্দ কখনো পদ্যের ছন্দ হবে না, পদ্যের ছন্দ তার ভিন্নতা রক্ষা করবে। পুরুষকে নারীর ও নারীকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি করা যায়, কিন্তু তাতে তাদের পার্থক্য দূর হয় না। বিনু দু'রকম ছন্দই অনুশীলন করতে যত্নবান হয়েছে, যার যেখানে স্থান তাকে সেখানে বসিয়েছে, একের জায়গায় অপরকে বসায়নি। তার কবিত্ব গদ্য ও পদ্য উভয়ের আশ্রয় নিয়েছে। যখন পদ্যের আশ্রয় নিয়েছে, তখন তা হয়েছে কবিতা। যখন গদ্যের আশ্রয় তখন প্রবন্ধ বা কাহিনী।

প্রেরণা

বিন্নু প্রেরণায় বিশ্বাস করে। সম্পাদকের তাগিদে বা প্রিয়জনের সংকেতে যা কলমের মুখ দিয়ে বেরোয় তাতে রূপ গুণ ও প্রাণ থাকলেও তা ডাইনামিক নয়। প্রেরণা যেন অনুকূল বায়ু, যখন বয় তখন তরী আপনি চলে, তাকে চালিয়ে নিতে হয় না, কেবল দিক ঠিক রাখতে হয়। যখন বয় না তখন নৌকা চলে গরজের ঠেলায়। ঘাটে পৌঁছয় বই-কি, কিন্তু তাতে ফূর্তির নাম গন্ধ নেই। লেখা উতরে যায়, হয়তো হাজার বছর বাঁচে, কিন্তু নাচে না, নাচায় না।

বিন্নুকে বলেছিলেন এক আলাপী, 'মশাই, গুটিকতক কবিতা কি গল্প লিখুন দেখি, যা পড়ে মউজ পাব, মাতোয়ারা হব। তা নয় তো ভাষার হেঁয়ালি, ভাবের কুহেলী, নিজেও খাটবেন, আমাকেও খাটাবেন।'

কথাটা বিন্নুর মনে লেগেছিল। লেখার পিছনে বিস্তর খাটুনি থাকে, খুব বড় বড় লেখকদেরও। কিন্তু তাঁরা সে খাটুনি গোপন করতে জানেন। এমন ভাব দেখান যেন হাওয়ায় উড়ছেন, স্রোতে ভাসছেন, একটুও ভয় ভাবনা নেই, তাগিদ বা গরজ বা ঠেলা কাকে বলে খোঁজ রাখেন না। অসাধারণ ফূর্তিবাজ লোক তাঁরা, অন্তত রচনা পড়ে তাই মনে হয়। কাউকে তাঁরা বুঝতে দেন না যে ফূর্তির আড়ালে আর এক মূর্তি আছে। দারুণ অধ্যবসায়, অক্লান্ত শ্রম, অসংখ্য কাটাকুটি তাঁদের দৈনিক বরাদ্দ।

রূপ গুণ ও প্রাণচর্চা উত্তম, কিন্তু যথেষ্ট নয়। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে কী এক দুর্বার প্রেরণা, সে প্রেরণা জীবসৃষ্টির মূলেও। সে যখন আসে তখন বোবা মানুষ গান গেয়ে ওঠে, পঙ্গুর পায়ে নাচন লাগে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। কবির শোক তখন শ্লোক হয়ে উড়ে যায় এমন অবলীলায় যে সকলের মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত। লোকের ধারণা বাল্মীকিকে এক মুহূর্ত ভাবতে হয়নি নিষাদের কাণ্ড দেখে। হয়তো তাই, কিন্তু তার আগে তপস্যা করতে হয়েছিল এক মনে। সে তপস্যা দিনের পর দিন। দৈনন্দিন। সে সাধনা বাণীর সাধনা।

প্রতীক্ষা

প্রেরণার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়। কার বরাতে কখন আসে জোর করে বলা যায় না। সমুদ্রের জোয়ার কখন আসে মাঝিরা তা জানে, আকাশের হাওয়া কখন আসে তাও বোধ হয় তাদের জানা। কিন্তু প্রেরণার আসা-যাওয়ার সময়-অসময় নেই। কবিরা এইটুকু খবর রাখেন যে, প্রেরণা হঠাৎ কখন এসে হাজির হয়, কবিকে প্রস্তুত হবার অবকাশ দেয় না, প্রায়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় পায়। এমন কবি নেই যিনি প্রেরণার করুণা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এমন কবির সংখ্যাই বেশি যাঁরা প্রেরণার করুণার মুহূর্তে অন্য কাজে রত। কাজটা হয়তো দরকারী, হয়তো বৈষয়িক। কিন্তু প্রেরণা তার জন্যে দাঁড়াবার পাত্রী নয়।

সেইজন্যে কবিদের মতো দুঃখী আর নেই। কবি অর্থে এখানে শিল্পীদের সবাইকে বুঝতে হবে। শিল্পীরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও যার দেখা পান না সে হয়তো একদিন অতি অসময়ে এসে দেখা দিল, তখন তার জন্যে না আছে আয়োজন না আছে অবসর। হাতের কাজ ফেলে তার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে না হতেই সে হয়তো অদর্শন হয়েছে। তখন অনুশোচনাই সার।

তাঁরই জিৎ যে কবি সব সময় সতর্ক থাকেন, অন্য কাজে হাত দিলেও কান খাড়া রাখেন প্রেরণার পদধ্বনির জন্যে। কিন্তু তেমন কবি ক'জন। বিনু তো অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের একজন হতে পারল না। দৈবাৎ এক আধ দিন সে প্রেরণার আঁচল দেখে হাতের কাজ ফেলে উঠে আসে, পলাতকার আঁচল চেপে ধরে, ছাড়ে না। কিন্তু তেমন এক আধ দিন তো আঙুলে গোণা যায়। জীবনে ক'দিন! হাতের কাজ ফেলে উঠে আসার স্বাধীনতা তার নেই, জীবিকার দেবী ঈর্ষা-পরায়ণা। তিনি অবশ্য নিত্য নিয়মিত বিশ্রাম দেন। কিন্তু প্রেরণাও এমন মানিনী যে বিশ্রামের সময় আসবে না, যদি আসে তো বিনুর শক্তি থাকে না তাকে ধরবার। সেইজন্যে তার সব থেকেও কিছু নেই। রূপ গুণ প্রাণ তার তূণে রয়েছে, তূণ থেকে নিয়ে ধনুকে জুড়তে পারছে না, প্রেরণা নেই। প্রেরণা যদি পায় তো শক্তি পায় না। শ্রান্ত। কিম্বা সময় পায় না। ব্যস্ত।

প্রজ্ঞা

প্রেরণা এমনিতে অন্ধ। তার হাতে ছেড়ে দিলে তরী যে কোন্ পাথরে আছাড় খেয়ে ডুববে, কোন্ ঘুর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে যাবে, তার ঠিকানা নেই। সেইজন্যে প্রেরণার সঙ্গে চাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার কাজ দিক্ দেখানো।

প্রেরণারও প্রয়োজন আছে, প্রজ্ঞারও। কেউ কারো স্থান পূরণ করতে পারে না। বিন্নুর এক কবি-বন্ধুর দিনরাত প্রেরণা আসত, তিনি দিবারাত্রি লিখতেন। কিন্তু কবি ও কবিতা উভয়েরই কেমন এক দিশাহারা ভাব। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ভাব আসে তাই লিখি। আমি তো অত ভেবেচিন্তে লিখিনে যে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারব কোন্ দিকে যাত্রা, কী আছে সে দিকে।

এই নিরুদ্দেশ যাত্রার একটা উন্মাদনা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা নিষ্ফলতাও আছে। ট্রেনে চড়তে প্রথমটা বেশ ফুর্তি লাগে, কিন্তু ট্রেন যদি কোথাও পৌঁছে না দেয়, যদি ভুল রাস্তায় চলে বা নামবার স্টেশন অতিক্রম করে যায়, তা হলে ফূর্তির পরে আসে বিরাগ। সেটা কবির জীবনেও অবশ্যম্ভাবী। যদি না প্রেরণার সাথী হয় প্রজ্ঞা।

নিয়ে যাবার ভার প্রেরণার উপর। পৌঁছে দেবার ভার প্রজ্ঞার উপর। যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা জাগেনি তাঁকে প্রজ্ঞার জন্যে তপস্যা করতে হবে। কেবল সৃষ্টির আবেগ নয়, দৃষ্টির আলোকও কবির প্রার্থনীয়। সত্যিকার কবিকে একাধারে

স্রষ্টা ও দ্রষ্টা হতে হবে। যাঁর দৃষ্টি নেই বা চোখের উপরকার পর্দা খোলেনি তিনি লৌকিক অর্থে কবি হতে পারেন, শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু সত্যিকার কবি বা শিল্পী হচ্ছেন মানবজাতির নেতা। জনগণমন অধিনায়ক। তিনিই যদি অন্ধ হন তবে তাঁর দ্বারা নীয়মান যারা তাদের দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির এই অংশটি সুবিদিত।

"সদর স্ট্রিটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত।"

সেই দিনই কবি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনা করেন। অনুরূপ স্বপ্নভঙ্গ অন্য অনেক কবির জীবনে ঘটেছে। বিনুরও।

দৃষ্টিলাভ

বিনুর জীবনের একটি বিশেষ দিনে নয়, একটি বিশেষ বয়সেও নয়, কিন্তু অন্তরে অকস্মাৎ দীপ জ্বলে উঠেছে। তার মনে হয়েছে সে যেন এই বিশ্বব্যাপারের তল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে। তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোথাও কিছু অপরিচ্ছন্ন নেই। এ যেন সহসা বিদ্যুতের আলোয় দিক্

দেখা। পর মুহূর্তে সব অন্ধকার। বরং আরো নিবিড় অন্ধকার।

এ রকম একটা অভিজ্ঞতা হয়তো পাঁচ-সাত বছরে এক বার আসে। হয়তো আরো দীর্ঘ ব্যবধানে। কিন্তু যখন আসে তখন সংশয় সরিয়ে দেয় একটি চমকে। সেই একটি পলকের পরে স্বপ্নের মতো মনে হয় কী যেন দেখেছি, কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না।

স্বপ্নের মতো অলীক বোধ হলেও বিন্নু তার নিজের চোখে দেখেছে, এ বিশ্বের কোথাও কোনো অপূর্ণতা নেই, সব পূর্ণ। অসার্থকতা নেই, সব সার্থক। অসুন্দর নেই, অশিব নেই, অসত্য নেই, সব সত্য শিব সুন্দর। সব অমৃতময়। উজ্জ্বল।

কিন্তু দেখলে কী হবে, বিশ্বাস করা সহজ নয়। যে দেশে বারো ঘণ্টা অন্তর দিন হয় সে দেশে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করা সহজ। কিন্তু যে দেশে ছ'মাস রাত্রি, ছ'মাস দিন, সে দেশে যদি কোনো শিশুর প্রত্যয় না হয় যে সূর্যের আলো বলে কিছু আছে, যদি ভ্রম হয় যে আপন চোখে যা দেখেছে তা স্বপ্ন, তবে তাতে আশ্চর্য হতে নেই। সেদেশের শিশুর পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক।

তেমনি বিন্নুর পক্ষে। সে যা সত্যি দেখেছে তাও মায়া বলে সন্দেহ করেছে, কিন্তু যতই অবিশ্বাস করুক না কেন একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। জীবনে যতবারই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হয়েছে প্রতিবারই একটি জায়গায় ঠেকেছে।

ধ্যান করলেই এ জগতের পরিপূর্ণ রূপ অন্তরে উদ্‌ভাসিত হয়, যদিও তা এক নিমেষের তরে, যদিও তা স্বপ্নের মতো অলীক। বাইরের কোনো মাপকাটি দিয়ে তাকে মাপা যায় না, সেইজন্যে আরো অবাস্তব লাগে।

তা হলেও বিনুকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তার আকস্মিক দৃষ্টিলাভ। স্বপ্নই হোক আর মায়াই হোক, আর মতিভ্রমই হোক, সে যা দেখেছে তা আছে।

রিয়ালিজম

পলকের জন্যে হলেও বিনুর দৃষ্টিতে পূর্ণতার একটা আভাস ঝলকেছে। সেই আভাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অতি বাস্তবকেও অপূর্ণ মনে হয়। যথার্থই তা অপূর্ণ কি না বিনু কী করে জানবে! কিন্তু যতদিন পূর্ণতার একটা আলেখ্য হাজার অস্পষ্ট হলেও জাগরূক রয়েছে তার অন্তরে, তত দিন সে আর পাঁচ জনের মতো বাস্তববাদী হতে অক্ষম। সাধারণত বাস্তব সত্য বলে যা বিকায় তা বিনুর মতে অপূর্ণ সত্য।

বিনু যে কেন রিয়ালিস্ট বলে আত্মপরিচয় দেয় না এই তার কৈফিয়ৎ। তা বলে রিয়ালিটি সম্বন্ধে তার বৈরাগ্য নেই। বরং রিয়ালিটিকেই তার দরকার বলে রিয়ালিজমে অনাস্থা। মধু চায় বলেই সে গুড় দিয়ে কাজ সারে না। তবে পৃথিবীতে গুড়ও থাকবে, গুড়ের চাহিদাও থাকবে, এমন মানুষও থাকবে

যারা গুড় পেলে মধু চাইবে না। এও বড় মজার কথা যে, যারা মধু ভালোবাসে তারা গুড়ও ভালোবাসে এবং মাঝে মাঝে মুখ বদলায়। রিয়ালিজমে অনাস্থা আছে বলে বিন্নু যে রিয়ালিস্টদের রচনা দূরে সরিয়ে রাখে তা নয়। পড়ে তারিফ করে।

কিন্তু তার জিজ্ঞাসার নিরসন হয় না তাতে। এর জন্যে তাকে যেতে হয় মিস্টিকদের কাছে। মিস্টিক বলে যাঁদের পরিচয় তাঁদের রচনার সবটা আবার মিস্টিক নয়, তাই নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে না। খাঁটি রিয়ালিজম যত না দুষ্প্রাপ্য খাঁটি মিস্টিসিজম তার চেয়েও দুর্লভ। কল্পনার মিশাল উভয়ত্র। ভাগ্যক্রমে কল্পনা কাকে বলে বিন্নু তা বোঝে। দেখলেই চিনতে পারে। নিজেও সে একজন কল্পনাবিহারী। নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর যেটুকু থাকে সেইটুকুই সে নেয়। নিতে নিতে সে এক সময় রিয়ালিটির স্বাদ পায়। রিয়ালিস্ট বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের লেখাতেও। মিস্টিকদের লেখাতেই বেশি। নামে কী আসে যায়! লোকে যাঁকে রিয়ালিস্ট বলে তিনি যে আদপেই মিস্টিক নন এটা ভ্রান্তি। আর লোকে যাঁকে মিস্টিক বলে তিনিও এক এক সময় রিয়ালিস্ট। একই মানুষ দুই হতে পারে। হয়ে থাকে।

দুঃখের বিষয়, মিস্টিকরা প্রায়শ সাহিত্যিক গুণে বঞ্চিত। তাঁদের লেখনী সাহিত্যিকের লেখনী নয়, তাই তাঁদের হাতে যা হয় তাকে সাহিত্য বলতে বাধে। পক্ষান্তরে রিয়ালিস্টরা সাহিত্যনিপুণ।

সত্যের অপলাপ

পূর্ণ সত্য দূরের কথা, আংশিক সত্যকেও যাঁরা সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁরা লিখতে লিখতে আসলটি হারিয়ে ফেলেছেন, জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করেছেন কাল্পনিককে। হামেশা এ রকম ঘটে। সত্য—তা সে পূর্ণই হোক আর অপূর্ণই হোক—সহজে ধরা দেয় না। ফাঁক পেলেই পালায়। পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করব, না লেখা শেষ করব? যদি লেখা শেষ করার তাড়া থাকে তবে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। রিয়ালিস্টরা দু' বেলা এই কর্ম করেন, মিস্টিকরাও তাড়া খেলে।

তাড়া জিনিসটা ভালো নয়। কিন্তু দুনিয়া জায়গাটাও সুবিধের নয়। বিনুর এক লেখক-বন্ধু তাকে একবার বলেছিলেন, "আমরা যদি ডস্টয়েভস্কি হতুম পেটের জ্বালায় লিখতুম, আর তা হলেই আমাদের লেখা প্রাণ পেতো। ক্ষুধার মতো বাস্তব কী আছে!" বিনু লক্ষ্য করেছে যে যাঁরা নিয়মিত লেখেন তাঁদের সকলের না হোক, অধিকাংশেরই একটা না একটা জ্বালা আছে। কিন্তু জ্বালার তাড়নায় লিখতে গেলে কল্পনার মিশ্রণ অপরিহার্য।

যেক্ষেত্রে ত্বরা নেই, প্রচুর অবসর পড়ে রয়েছে, সে ক্ষেত্রেও লেখনী বিশ্বাসঘাতকতা করে। লিখতে বললে এমন কথা বানিয়ে লেখে যা লেখকের অভিপ্রেত নয়। কার অভিপ্রেত তাও সে জানে না। লেখনীর অভিপ্রেত বললে বিশ্বাসের

অযোগ্য হবে। মানতে হয় যে লেখকের ভিতরেই একজন রয়েছেন, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কৌতুকময়ী।' লেখকের কল্পনাবৃত্তি তার কলমের রাশ কেড়ে নেয়, কলম চালায়। লেখক চেয়ে দেখে, তার মন্দ লাগে না।

যেমন করেই হোক কল্পনার সংক্রমণ ঘটে সত্যের সহিত। তাতে যদি সত্যের অপলাপ হয় তবে সাহিত্যে সত্যের চেয়ে সত্যের অপলাপই অধিক। সত্যের সন্ধানীদের তা হলে অন্যত্র যেতে হয়। তাঁরা দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করুন। কিন্তু সাহিত্য কোনো দিন কল্পনার আঁচল ছাড়বে না। কল্পনার সঙ্গে তার আদ্যি কালের সম্পর্ক, বোধ হয় অন্ত কালেরও।

রক্ষা এই যে কল্পনার সাহায্য নিলে সত্যের অপলাপ ঘটে না। অন্তত বিনুর তো তাই বিশ্বাস।

সাহিত্যের সত্য

সাহিত্যের সত্য দর্শনবিজ্ঞানের সত্য নয়। কারণ সাহিত্যের সত্য কল্পনামিশ্রিত। দর্শনবিজ্ঞানের সত্য কল্পনা-বর্জিত। এটা একটা মস্ত তফাৎ। কিন্তু আরো একটা তফাৎ আছে, সেটা আরো বড়।

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকরা হৃদয় দিয়ে দেখেন না, হৃদয় দিয়ে লেখেন না। তাঁদের হৃদয় আছে নিশ্চয়, কিন্তু হৃদয়ের জবানবন্দী তাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। সত্য তাঁদের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আসে না, আসে মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে।

তাতে হৃদয়ের শোক তাপ উল্লাস উন্মাদনা নেই। থাকতে পারত আবিষ্কারের আনন্দ। অন্বেষণের বেদনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁর আনন্দ বেদনা ব্যক্ত করেন না। তাঁর একমাত্র বচনীয় সত্য। পক্ষান্তরে সাহিত্যিক তাঁর নিজের অনুভূতির ছাপ রেখে দেন তাঁর সত্যের সর্বাঙ্গে। এমন কি, তাঁর অনুভূতিটাই অনেক সময় তাঁর সত্য। আদি কবির প্রথম শ্লোকে উক্ত হয়েছে অন্য কোনো মহান সত্য নয়, তাঁর নিজেরই শোকাকুল অনুভূতি।

কবিকে বেশি দূর যেতে হয় না, সে তার ঘরে বসে তার নিজের হৃদয়ে যা অনুভব করে তাও সত্য। তেমন সত্য সে প্রতি দিন জগৎকে দিতে পারে একটা অভিনব আবিষ্কার হিসাবে নয়, একটা পরিচিত অভিজ্ঞতা রূপে। সাহিত্যে কেউ কিছু আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায় না। যেসব সত্য নিয়ে সাহিত্যের কারবার সেসব কোন মান্ধাতার আমলের। কবিরা চির-পুরাতনকে নিত্য নূতন অনুভব করেন, আর অপরের অনুভূতি উদ্রেক করেন। যাঁরা পড়েন তাঁদেরও সেটা একটা পুরাতন অথচ নূতন অনুভূতি।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যের তুলনা হয় না প্রধানত এই কারণে। সাহিত্য মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দেয় না, সে কাজ দর্শনবিজ্ঞানের। কিন্তু সাহিত্য মানুষের হৃদয়কে একদিনও নীরস হতে দেয় না। চির-হরিৎ রাখে। সাহিত্যের সত্য হাজার হাজার বছর আগে যা ছিল আজও তাই। জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ নিয়তি-প্রকৃতি

বিরহ-মিলন প্রেম-অপ্রেম—এদের নিয়ে অন্তহীন আদিহীন বিশ্বপ্রবাহ। সতত সে পূর্ণ, সার্থক, শিব, সুন্দর, সত্য।

পরিবর্তন

সবই যদি ছিল ও রয়েছে ও থাকবে তবে পরিবর্তন কি মিথ্যা? তবে বিবর্তন কি ভ্রম? মানুষ কি মানুষ ছিল দশ লাখ বছর আগে? দশ লাখ বছর পরে মানুষ কি মানুষ থাকবে?

না, পরিবর্তন মিথ্যা নয়। বিবর্তনও নয়। জগতের প্রত্যেকটি কণা পরিবর্তমান। বিবর্তমান। দশ লাখ বছর পরে মানব বলে যদি কোনো জাতি থাকে তবে বিবর্তিত ভাবে থাকবে, হয়তো বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করবে। হয়তো এক একটি ব্যক্তি এক এক হাজার বছর বাঁচবে। হয়তো জরা ব্যাধি দারিদ্র্য কারো জীবন কালো করবে না। সব অবিচার সব অত্যাচার বিলুপ্ত হবে।

কিন্তু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ প্রেম-অপ্রেম যাবে কোথায়! দশ কোটি বছরের পরেও বিরহ-মিলনের অবসান নেই। আর মৃত্যু? মর্ত্য যতকাল মৃত্যু তত কাল। কাল যতকাল মর্ত্য তত কাল। তত কাল মানুষ হয়তো টিকবে না, বিজ্ঞানের বল অসীম নয়। কিন্তু যে থাকবে সে মানুষেরই মতো বাঁচবে ও মরবে, হাসবে ও কাঁদবে, পাবে ও হারাবে, ভালোবাসবে ও ভালোবাসা চাইবে। এ সকলের পরিবর্তন নেই, যদি থাকে তো বাইরের দিকে। এদের পরিবর্তন ধরন ধারণে।

তখনকার মানুষ বা নরদেব এমনি ব্যর্থ হবে বিশ্বব্যাপারের অর্থ খুঁজে। এমনি পুরস্কৃত হবে অকস্মাৎ চপলা চমকে। এমনি সাধনা করবে অপরূপকে রূপ দিতে, অনির্বচনীয়কে বচন দিতে। দিতে গিয়ে হারাবে, যা দেবে তার অনেকখানি কল্পনা। কৌতুকময়ী তখনো তার লেখনী নিয়ে খেলা করবে। আর তার অনুভূতি তাকে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হতে দেবে না, সাহিত্যিক বা শিল্পী হইয়ে ছাড়বে।

বিনুর সেইজন্যে এক এক সময়ে মনে হয়, কাল একটা মায়া। যা আছে তা সত্তা আর তার রূপ রূপান্তর। এ-ই রিয়াল, বাকি আন্‌রিয়াল। বিনু মাঝে মাঝে মায়াবাদী হয়ে ওঠে।

প্রকৃতি

বিনুর হুঁশ হয় যখন খিদে পায়, শীত করে, মাথা ধরে। তখন আর মায়াবাদ নয়, রূঢ় বাস্তববাদ। তখন সে বেশ ভালো করেই বুঝতে পারে সন্ন্যাসীরা কেন প্রকৃতির প্রতি বিরূপ। প্রকৃতি ঠাক্‌রুন এমন সুরসিকা—অথবা এমন অরসিকা—যে, শীতকালে শীত পাইয়ে দেন, রাত্রিকালে ঘুম পাইয়ে দেন, দিনে অন্তত একবার খিদে পাইয়ে দেন। বয়স-কালে আর যা পাইয়ে দেন তা বলে কাজ নেই।

প্রকৃতির এই দাসত্ব কারই বা সহ্য হয়! মানুষ তাই যুগে যুগে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে এবং তাকেই ঠাওরেছে মুক্তি। বিনুরও বিশ্রী লাগে যখন তার অনুভূতি বা কল্পনার মাঝখানে

হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে ক্ষুধার বা পিপাসার। এসব ছোট কথা ভাবতে নেই, কিন্তু যতক্ষণ না এক গ্লাস জল বা একটা ফল পেটে পড়েছে ততক্ষণ সব বড় বড় চিন্তা ঘুলিয়ে যায়। ভীষণ রাগ ধরে প্রকৃতি ঠাকুরাণীর উপর। এ কী রঙ্গ তাঁর! অসময়ে রসভঙ্গ কেন!

বিনুকে কত লোক বলেছে, "জীবনটা তো বেশ ভালোই। কিন্তু যদি পেটটা না থাকত।" বিনু কি সহজে তা মানতে চায়, কিন্তু সময় মতো চারটি খেতে না পেয়ে মানতে বাধ্য হয়েছে। ছেলেবেলায় ভাবতে হয়নি, মা-ঠাকুমা ছিলেন। বড় হয়ে কলেজের মেসে হস্টেলে পেট ভরে খেতে পায়নি, অগত্যা মেনেছে। শোনা যায়, জলতেষ্টার সময় একটু জল খেতে না পেয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য শক্তি-বন্দনা করেছিলেন। গঙ্গার স্তোত্র। প্রকৃতি আমাদের সকলেরই মাথা হেঁট করিয়ে ছাড়ে! এক ভদ্র মহিলা বেশ একটু ঢং করে বলেছিলেন, "ওমা! ভাবতে ঘেন্না লাগে, গুরুদেব দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খান।" তিনি নাকি শক্ পেয়েছিলেন স্বচক্ষে দেখে। তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল গুরুদেব যখন, তখন কোনো অলৌকিক উপায়ে জীবন ধারণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও আহার করতে হয়। দাঁত দিয়ে।

প্রকৃতি দেবীর এই রাগরঙ্গ যে মানুষকে কত রকম শোচনীয় অবস্থায় ফেলে ও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করায় তার লেখা-জোখা নেই। রিয়ালিস্ট বলে যাঁরা পরিচয় দেন তাঁদের প্রধান কর্ম হলো প্রকৃতির হাতে মানুষের বাঁদর নাচ ফলাও করে

আঁকা। বিন্নু কিন্তু ওটাকে পরিহাস বলে উড়িয়ে দেয়। দাসত্বের গ্লানি তার গায়ে লাগে না, কারণ যাঁর দাসত্ব তিনি যে রঙ্গিণী।

নখদন্ত

কিন্তু তামাসা নয়। ইংরেজীতে একটা বচন আছে, প্রকৃতি নখদন্তে রক্তিম। ক্ষুধার আহার আহরণ করবার জন্যেই এসব। প্রতিদিন কী নৃশংস জীবহত্যা চলেছে গ্রামে নগরে জঙ্গলে জলে! এমন কি আকাশেও! পাখীদের ডানা দেওয়া হয়েছে খোরাক জোটানোর জন্যে।

মানুষের সমরসম্ভার—সঙীন বন্দুক মেশিনগান কামান ট্যাঙ্ক এরোপ্লেন—সেই নখদন্ত ও ডানার রকমফের। মানুষ এসব দিয়ে আহার সংগ্রহ করে, দুর্বলের রক্ত শোষে। সভ্যতার মুখোস খসে পড়ে যুদ্ধ বিগ্রহের উত্তেজনায়। শিউরে উঠতে হয় দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া দেখে। বিন্নুবাবু যে সন্দেশ খান সে কোন গরিবের ছেলের না-খাওয়া দুধ। তিনি যে নিরামিষাশী হয়ে ত্রাণ পাবেন সে পথ বন্ধ।

তারপর খবরের কাগজে নারীধর্ষণের বার্তা পড়ে সে আঁতকে ওঠে। কী সর্বনাশা প্রবৃত্তি! দেয়ালে টিকটিকির কাণ্ড দেখে তার গায়ে কাঁটা দেয়। এই বিভীষিকার নাম বংশরক্ষা। মানুষ বলো, ইতর প্রাণী বলো, পৃথিবীতে এসেছে এই করে, টিকে আছে এই করে, লক্ষ লক্ষ বছর টিকে থাকার দাবি রাখে এই করে। রূঢ় বাস্তব। নিষ্ঠুর বাস্তব।

প্রকৃতি যার নাম সেটা একটা দুঃস্বপ্ন। তার হাত থেকে

মুক্তি পেতে হলে সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেয়। কেবল সন্ন্যাসী নয়, পওহারী। বায়ুভুক্‌। এ কথা বিনু কত বার ভেবেছে। কিন্তু তার অন্তর সায় দেয়নি। আবার এর বিপরীতটাও ভেবেছে। বীরাচারী হতে চেয়েছে। তাতেও অন্তরের আপত্তি। প্রকৃতির সঙ্গে অসহযোগের নাম সন্ন্যাস। অতি সহযোগের নাম বীরাচার। উভয়ের উদ্দেশ্য এক। সেই দুঃস্বপ্ন থেকে নিস্তার।

কিন্তু সত্যিই কি সে একটা দুঃস্বপ্ন? না, বিনু যে তাকে শুভ দৃষ্টির আলোয় দেখেছে। যদিও চকিতের দেখা তবু চিরকালের চেনা। যাই হোক না কেন তার বাইরের পরিচয়, সে দুঃস্বপ্ন নয়। তার হাত থেকে নিস্তারের কথা ওঠেই না। ওটা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন জড়বাদ। ওতে মুক্তি নেই। সত্যিকার মুক্তি প্রকৃতিকে স্বীকার করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে উদ্দেশ্য মিলিয়ে, ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। সত্যিকার মুক্তি লীলার নামান্তর। নিত্য লীলার।

ছন্দ রক্ষা

সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা থেকে অণু পরমাণু পর্যন্ত যেখানে যে কেউ আছে, যা-কিছু আছে, সকলেই আপন আপন অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত ছন্দ রক্ষা করে চলেছে। কারো মুখে কোনো নালিশ নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম মানুষ। প্রকৃতি দেবী বোধ হয় জানতেন না যে মানুষ তাঁর শাসন মানবে না, বিদ্রোহ করবে।

বিদ্রোহের কারণ কি নেই ? প্রতি দিন এ জগৎ মানুষের দেহমনকে আঘাত করছে, মানুষের বুকে বাজছে। কয়েকদিন আগে দেখি একটা বাচ্চা হনুমান আমার আপিসঘরে ঢুকে কী করছে। আমাকে দেখেই চেঁচামেচি করতে করতে জানালা দিয়ে এক লাফ। কিন্তু লাফ দেবার পর ক্ষণেই পুনঃপ্রবেশ। তাকে তাড়িয়ে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। কিন্তু তার পরে যা শুনলুম তাতে আমার মনে হলো অন্যায় করেছি। ও ছিল শরণাগত। অনেক ক্ষণ ধরে শুনতে থাকলুম বাইরে লাফালাফি দাপাদাপি চলেছে, একটা হনুমান তাকে মারতে তাড়া করে আসছে, তার মা তাকে কোলে চেপে ধরছে, অন্যান্য মায়েরাও তাকে ঘিরে বসছে। শুনলুম হনুমানের দলে একটি-মাত্র পুরুষ, আর সকলে নারী। যেমন বৃন্দাবনে। এই হতভাগা শিশু হনুমানটি পুরুষ। তাই এঁর জনক স্বয়ং এঁকে বধ করতে চান। জনকের চোখে ইনি সন্তান নন। ইনি প্রতিদ্বন্দ্বী। এঁকে বড় হতে দেওয়া নিরাপদ নয়। এই বয়সেই দাঁত দিয়ে পেট চিরতে হবে। শুনলুম এ রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, হনুমান তার ছেলের পেট চিরে রাস্তায় ফেলে গেছে। বীভৎস দৃশ্য।

তবে এও শোনা গেল যে মায়েরা তাদের ছেলেদের কোনো মতে বাঁচিয়ে সন্ন্যাসী হনুমানের দলে ছেড়ে দেয়। সে দলে সকলেই পুরুষ, সকলেই চিরকুমার। সেই চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে শিশুটি প্রাণে বাঁচে। আমাদের রামায়ণের হনুমান বোধ হয় সন্ন্যাসী হনুমানের দলে 'মানুষ' হয়েছিলেন। পালের

গোদা হলে তিনি এক পাল স্ত্রী নিয়ে আটকে পড়তেন, শ্রীরামের দূত হয়ে লঙ্কায় লাফ দিতে গেলে হারেমটি বেহাত হতো। বালীর হারেম তো সুগ্রীবকে ভজনা করল বালী মরতে না মরতে। হনুমানদের সমাজে গণিকা আছে কি না খবর নিলে হয়। তা হলে মানব-সমাজের প্যাটার্ন মানব-বিবর্তনের পূর্বেই স্থির হয়ে গেছে বলতে হবে।

বিদ্রোহের কারণ কি নেই? মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধ, দয়া মায়া, কেমন করে সহ্য করবে এ ব্যবস্থা!

ছন্দ-জিজ্ঞাসা

মানুষ যা হয়েছে তা বিদ্রোহ করতে করতেই হয়েছে। প্রকৃতির শাসন মেনে নিলে এত দিন হনুমান হয়ে রইত! মানুষের ছন্দ রক্ষা তা হলে বিদ্রোহের অধিকার অব্যাহত রাখা। তার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় রক্তের দাগ। এটা অকারণ নয়। যখনি যে টুঁ শব্দটি করেছে পালের গোদা তার গলা টিপে ধরেছে, কোনো মতে ছাড়ান পেয়ে সে গোদার বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে, পরে এক দিন নিজেই গোদা হয়ে গদিয়ান হয়েছে। তখন তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ।

কিন্তু এই কি সব? মানুষ কি কেবল বিদ্রোহ করেছে, বিদ্রোহের দ্বারাই এক প্রকার ছন্দ রক্ষা করেছে? না, না। মানুষ তো শুধু মানুষ নয়, সে সত্তা। সে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র নীহারিকার সাথী। সে চলে অণু পরমাণুর সাথে তাল রেখে। তাকে ডাক দিয়ে যায় শরতের মেঘ, বসন্তের হাওয়া। সে

সাড়া দেয় বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে। গুহার গায়ে হিজিবিজি এঁকে। এমনি করে সঙ্গীতের বিবর্তন, চিত্রকলার বিবর্তন হয়েছে। কাব্যের, ভাস্কর্যের, স্থাপত্যের। আর্ট এই ভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আর্টের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রিলিজন। কিম্বা রিলিজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর্ট।

মানুষকে বিদ্রোহী বললে অর্ধেক বলা হয়, হয়তো অর্ধেকেরও কম। মানুষ যে পরিমাণে পৃথক সে পরিমাণে বিদ্রোহী। যে পরিমাণে অভিন্ন সে পরিমাণে সূর্য নক্ষত্রের ধারাবাহী। তার ছন্দরক্ষা তাদেরই মতো অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মেনে চলা। হঠাৎ মনে হতে পারে এটা একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। কিন্তু সেটা আমাদের ভ্রম। এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির কাছে নিত্য নিয়ত একটা চ্যালেঞ্জ। রহস্যভেদ করতে কৃতসংকল্প হয়ে আমরা দর্শন বিজ্ঞানের শিখরে উঠেছি। কিন্তু শিখরের পরে শিখর, তার পরে শিখর, একটা আর একটার চেয়ে উঁচু। কবে যে আমরা চরম উচ্চতায় উপনীত হব কেউ বলতে পারে না, বোধ হয় কোনো দিনই না। ইন্‌টেলেক্‌ট্‌ দিয়ে যতটা রহস্যভেদ সম্ভব ততটা হবে। সঙ্গে সঙ্গে চর্চা চলবে ইন্‌টুইশনের। আর্ট, রিলিজন, এসব ইন্‌টুইশন-মার্গী।

বিনুর প্রিয়া তার কণ্ঠে শুনেছিলেন একটা বিদ্রোহের সুর, তাই তাকে ভালোবেসেছিলেন। সে বলল, যাকে তুমি ভালোবেসেছ সে আমার সবটা নয়। আমি কেবল বিদ্রোহী নই। আমি স্রষ্টা। আমি দ্রষ্টা।

দ্বন্দ্ব ও ছন্দ

সে ছান্দসিক। সে সুরসিক। সে সুপুরুষ। "জনম কৃতারথ সুপুরুষ সঙ্গ।" যে তাকে ভালোবাসবে সুপুরুষ বলেই ভালোবাসবে, সঙ্গ চাইবে। তা যদি না পারে, যদি ভালোবাসে একালের পালের গোদাদের দুশমন ও ভাবীকালের পালের গোদা বলে, তবে তার অভিমানে বাজে। এই হতভাগা হনুমানগুলোই কি তা হলে পৌরুষের প্রতিমাণ? এদের সঙ্গে বলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এদেরই অনুরূপ হওয়া কি তার জীবনের সার্থকতা? যদি এদেরই অনুরূপ না হয় তবে কী রূপ হবে? অতিহনুমান?

দ্বন্দ্বের যেমন একটা বীরত্বের দিক আছে তেমনি আছে একটা অনুকরণের দিক। হনুকরণের। মানুষ যার সঙ্গে লড়াই করে তারই ধারা ধরে। তারই ধাঁচে গড়ে ওঠে। এটা যে তার আন্তরিক অভিলাষ তা নয়। কিন্তু যুদ্ধে জেতার অপরিহার্য সর্ত। নাৎসীদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ডেমক্রাটরাও নাৎসী হয়ে উঠছে না কি?

বিনু অবশ্য তখনকার দিনে অতটা ভাবেনি, অত দেখতে পায়নি। কিন্তু এটুকু বেশ ভালো করেই বুঝেছিল যে তার প্রিয়া তাকে যা হতে বলছেন তা যদি সে হয় তবে নিজের মনের মতো হবে না। নিজেকে হারিয়ে বসবে। যে মানুষ তার আপনাকে হারিয়েছে সে যদি সারা দুনিয়াটা পায় তবে তার এমন কি লাভ? বাইবেলে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

এটা প্রকারান্তরে উপনিষদেরও জিজ্ঞাসা। যাতে আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? বিনু বিদ্রোহী বটে, কিন্তু সেই তার একমাত্র পরিচয় বা শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। সে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়টাই বহন করবে। এর জন্যে যদি দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাও সই।

না, সরে দাঁড়াতে হবে না। দ্বন্দ্ব করা যাবে। কিন্তু চোখ খোলা রেখে। জয়ের জন্যে সর্বস্ব না দিয়ে। সে বরং একশো বার হারবে, তবু আপনাকে হারাবে না। দ্বন্দ্ব বড় নয়, ছন্দই বড়। বিশ্বব্যাপারের বৃহত্তর বিধান ছন্দ রক্ষা। তার মধ্যে দ্বন্দ্বের স্থান আছে। তার উপরে নয়।

বিনুর দ্বন্দ্ব

বিনুকে অনেক দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু আমরা তার জীবনী আলোচনা করছিনে। তার সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনে কোন্ কোন্ শক্তি চক্রান্ত করছিল তাদেরই উপর আলোকপাত করছি। যারা সে চক্রান্তে যোগ দেয়নি তাদেরও গায়ে হয়তো আলোর ছটা পড়েছে। সেটা অনিচ্ছাকৃত ও অবান্তর। তা বলে তাদের বাদ দেওয়া যায় না।

দ্বন্দ্ব যে অপরিহার্য বিনু তা মানত। না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু দ্বন্দ্বের জন্যে যে সব দিতে হবে, সব দিতে দিতে আত্মাকেও, কিছুতেই এটা তার সইত না। যা সইতে পারে না তারই বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ যখন তার সহনের অতীত হয় তখন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহী হয়।

তার বন্ধুরা খোঁচা দিয়ে বলেন সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সে তা স্বীকার করে নেয়। আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী বললে বোধ হয় আরো যথার্থ হতো। কী করে যে কেউ তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পারে বিনুর তা বোধগম্য হতো না, এখনো হয় না। আত্মসম্মান বিসর্জন দিক্ দেখি! তখন সকলে ছি ছি করে উঠবে। কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্যের বেলা উলটো বিচার।

এই নিয়ে ঠোকাঠুকি বেধে যায় তার নিজের বন্ধুদের সঙ্গে। সে যে কোনো দিন দল গড়তে পারে না, দলের একজন হতে পারে না, দলে টিকতে পারে না এটা আশ্চর্য নয়। অথচ দলই তো একালের বলপরীক্ষার পূর্বস্থল। দলের আখড়ায় পাঁয়তারা না কষে কেউ কি আজকাল বাইরের ময়দানে কুস্তি লড়ে? কোনো দলেই যার ঠাঁই নেই কুরুক্ষেত্রে সে একলব্য। একলব্যেরই মতো তার বুড়ো আঙুল কাটা।

বিনুর দ্বন্দ্ব সেইজন্যে নিষ্ফল। একা মানুষের কলম চালনায় কোনো হনুমানের হনু ভাঙে না, তার দাঁত আস্ত থাকে। তা হলেও তাকে এক হাতে লড়াই চালাতে হবে।

বিনুর ছন্দ

আমি স্বতন্ত্র—এ যেমন সত্য, আমি অভেদ—এও তেমনি। বিশ্বের কেন্দ্র যেখানে সেইখানে আমারও কেন্দ্র। জীবনের কোনো অবস্থায় যেন কেন্দ্রচ্যুত না হই। যেন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকি। বিনু যাকে ছন্দ বলে তার অন্য নাম কেন্দ্রানুগত্য।

সে যতই স্বতন্ত্র হোক না কেন উৎকেন্দ্রিক নয়। তেমন স্বাতন্ত্র্যের ফল ছন্দপতন। নাচতে নাচতে তাল কেটে গেলে স্বর্গের অপ্সরাদেরও স্বর্গ হতে বিদায়। কবিদেরও কারো কারো জীবনে তাই ঘটে। স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাঁদের মত্ত করে, তাঁরা ভুলে যান যে জগতের কোথাও একটা কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের প্রতি বিশ্বস্ততার দায় আছে, কেননা সেটা তাঁদের নিজেদেরই কেন্দ্র। এই বিস্মৃতির পরিণাম উৎকেন্দ্রিকতা। সেটা একটা অভিশাপ। অবশ্য শাপমোচনের পথ খোলা থাকে।

বিন্নুর ছন্দের আদর্শ তখন থেকে একই রকম আছে। প্রেমই তাকে তার ছন্দের আদর্শ দেয়। কিন্তু তার প্রিয়ার এতে ঠিক সহযোগ ছিল না। তাঁর চোখে দ্বন্দ্বের আদর্শই বড় ছিল। এত বড় যে ওর তুলনায় ছন্দের আদর্শ অকিঞ্চিৎকর। বিন্নু তাঁকে যত বার বোঝাতে যেত তত বার ব্যর্থ হতো। তিনি মনে করতেন বিন্নু দ্বন্দ্বকাতর বলেই ছন্দের আড়ালে মুখ ঢাকছে। তার হাতে তলোয়ার নেই, আছে শুধু ঢাল। কোনো মতে আপনার চামড়াটি বাঁচানো একটা মহৎ আদর্শ নয়। তেমন করে এ ধরণী নবীন হবে না।

এই আদর্শবিরোধ বিন্নুর ভিতরেই রয়েছে। দুই আদর্শের ঠোকাঠুকি তাকে বিনিদ্র করেছে, সে নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারেনি, বোঝাবে কাকে!

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এসব কথা বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। কবিতার ছন্দের জন্যে

যেমন কান তৈরি করতে হয় তেমনি জীবনের ছন্দের জন্যে অন্তঃকরণ।

প্রেমের দ্বারা অন্তরের বিকাশ হয়। বিনুর জীবনে যেদিন প্রেম এলো সেদিন এলো বিকাশের প্রতিশ্রুতি। এক দিনের কাজ নয়, প্রতি দিনের কাজ। হয়তো এক জীবনের নয়, কোটি জীবনের। প্রেমের যেমন সীমা নেই, শেষ নেই, বিকাশেরও নেই চরম। সাহিত্য এই বিকাশের প্রকাশিত রূপ।

প্রেম

প্রেম হচ্ছে সেই রস যা বিশ্ববনস্পতির মূল থেকে ফুল পর্যন্ত প্রবাহিত। আদি রস বললে ভুল বলা হয় না, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। আদি রস, মধ্য রস, অন্ত্য রস, অনাদি ও অনন্ত রস। সর্ব রস। শুদ্ধ রস। রস।

বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে যার এমন সম্পর্ক তাকে নিছক জৈব ব্যাপার কিম্বা মানবিক ব্যাপার বললে খাটো করা করা হয়। ছোটখাটো মানুষেরা সেই রকমই ভাবে। তাদের জীবনযাত্রার সুবিধা অসুবিধার দিক থেকে ভাবলে আগুনকেও তেমনি ছোটখাটো দেখায়। উনুনের আগুন। লণ্ঠনের আগুন। বিড়ির আগুন। তাদের বিশ্বাস হয় না যখন শোনে, সেই একই আগুন জ্বলছে আকাশ জুড়ে তারায় তারায়। জলের স্থলের প্রতি কণিকায়।

কার ঘর কখন পোড়ে তার জন্যে আগুনের মাথাব্যথা

পড়েনি, সে তার নিজের নিয়মে চলে। সেটাও একটা নৈতিক বিধান। অনীতি বা দুর্নীতি নয়। গার্হস্থ্য নীতির সঙ্গে তার যদিও স্বতোবিরোধ নেই তবু সব সময় মিলও নেই। মাঝে মাঝে হাতও পোড়ে, কালেভদ্রে ঘরও পোড়ে, কদাচিৎ মানুষও পোড়ে। সকলে স্বীকার করে যে সেটা স্বাভাবিক। এত দূর স্বাভাবিক মনে করে যে বোমার অগুনে যখন শহরকে শহর পুড়ে যায় তখনো আগুনকে দোষ দেয় না। যারা আগুন নিয়ে খেলা করে তাদের নিরস্ত হতে বলে না।

অথচ প্রেমের বেলায় অন্য কথা। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক নীতি অগ্রগণ্য। এর বাইরে বা উপরে যদি কিছু থাকে তবে সেটা দুর্নীতি বা অনীতি। ইহুদী সমাজে লোষ্ট্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল, যীশু এসে বললেন, কে আগে ঢিল ছুঁড়বে! কে এত নির্মল! অন্যান্য সমাজে আর কিছু না হোক বহিষ্কারের ব্যবস্থা আছে। অসম্মানের ব্যবস্থা। মোটের উপর, মানুষের সমাজে প্রেমের স্বীকৃতি ভয়ে ভয়ে, ডুবে ডুবে, চুপে চুপে। এটা প্রেমের পক্ষে কলঙ্কের নয়, মানুষের পক্ষেই কলঙ্কের।

হাঁ, মানুষ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। তার নীতিবোধ এখনো সংকীর্ণ। তাই কথায় কথায় প্রেমকে বলা হয় দুর্নীতি বা অনীতি। আর্টকে বলা হয় ইম্‌মরাল বা আমরাল। বিন্নু এটা মানে না, মানতে পারে না, কারণ সে একটা বৃহত্তর নীতির আভাস পেয়েছে। তাতে বিপদ আছে। কিন্তু বিপদ বরণ করাই তো মনুষ্যত্ব।

প্রেমের গুরু

বিনুর জীবনে প্রেমের আবির্ভাব এই প্রথম নয়। কিন্তু এবার যে এলো সে আগুন। এমন প্রচণ্ড দাবি তার কাছে কেউ কোনো দিন করেনি। এই দাবির প্রচণ্ডতা তাকে পুরুষ করে তুলল। মানুষ করে দিল। সে দায়িত্ব নিতে, বিপদ বরণ করতে শিখল।

প্রেমের রাজ্যে এত দিন তার পথপ্রদর্শক ছিলেন চণ্ডীদাস ও দান্তে। চণ্ডীদাসের মতো সেও একদিন সহজিয়া হবে, উত্তমা নায়িকার সঙ্গলাভ করবে, নায়িকার মধ্যে দেবতাকে পাবে। "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" ভালোবাসতে জানলে এই মানুষের মধ্যেই সেই মানুষকে ভালোবাসা যায়। যারা ভালোবাসতে জানে তারাই মানুষকে ফেলে মূর্তি পূজা করে, তীর্থে তীর্থে বেড়ায়, হিমালয়ে অদৃশ্য হয়। বিনুর ভগবান উত্তমা নায়িকা। সে সহজিয়া।

তারপর দান্তের প্রভাব পড়ল তার জীবনে। তখন সে ভাবল, ইহলোকে হয়তো তার বিয়াত্রিসের সঙ্গসুখ পাবে না। কিন্তু ইহলোক আর কতটুকু! মৃত্যুর পরে এক দিন তার বিয়াত্রিস তার সঙ্গিনী হয়ে তাকে ধন্য করবে, তাকে নিয়ে যাবে তারা হতে তারায়, লোক হতে লোকান্তরে, স্বর্গ হতে বৈকুণ্ঠে। তাকে পৌঁছে দেবে দেবতার চরণপ্রান্তে। দু'জনে মিলে বন্দনা করবে তাঁকে। নারীর হাতেই দেবমন্দিরের চাবি। নারীর করুণা হলে দেবতার করুণা। মধ্যযুগের ইউরোপীয় কবিদের

মতো বিনুর মনে হতে লাগল সেও একজন ত্রুবাদুর (troubadour)। সে আর নারীকে ইহকালের জন্যে চাইল না, দূরে দূরেই রাখল।

দূরের মানুষ যে এই জীবনেই আপনি এসে তার কাছে টানবে এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। কেমন করে তার হাতে পড়ল সুইডিশ লেখিকা এলেন কেই'র লেখা "প্রণয় ও পরিণয়।" তখন থেকে তিনিই হলেন তার পথপ্রদর্শক। সোক্রেটিসের যেমন ডিওটিমা, বিনুর তেমনি এলেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন বিনু ইউরোপে গিয়ে তাঁর কাছে পাঠ নিত।

পরম প্রেম

এলেন কেই (Ellen Key) বিনুর মতো জিজ্ঞাসুদের জন্যে লিখে গেছেন :—

"The power of great love to enhance a person's value for mankind can only be compared with the glow of religious faith or the creative joy of genius, but surpasses both in universal life-enhancing properties. Sorrow may sometimes make a person more tender towards the sufferings of others, more actively benevolent than happiness with its concentration upon self. But sorrow never led the soul

to those heights and depths, to those inspirations and revelations of universal life, to that kneeling gratitude before the mystery of life, to which the piety of great love leads it."

পরবর্তী জীবনে বিনুর ধর্মে বিশ্বাস টলেছে, আর্টে বিশ্বাস টলমল করেছে, কিন্তু প্রেমে বিশ্বাস অটল রয়েছে। প্রেমে বিশ্বাস দৃঢ় থাকায় একে একে দৃঢ় হয়েছে আর্টে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস। শক্তি সবচেয়ে প্রেমেরই বেশি। বিনু তার সাক্ষী।

"How can Love, one of the great lords of life, take its freedom from the hands of society any more than Death, the other can do so ? ... Love and Death ... only these two powers are comparable in majesty."

এ কথাও লিখে গেছেন তিনি বিনুর মতো বিশ্বাসীদের জন্যে।

প্রেম বনাম সমাজ

বিশ্বের মূলনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে নরনারীর প্রেম নীতিসম্মত, সমাজের সম্মতি থাক বা না থাক। তাকে কাম বলে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা বিশ্বের মূলনীতি তার স্বপক্ষে। আর ধিক্কার শুনে কেউ কোনো দিন বিরত হয়নি, যদি না ইতিমধ্যে অবসাদ এসে থাকে।

কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে অনেক সময় দাম্পত্য প্রেমও ভর্ৎসিত হয়। কারণ তাতে গুরুজনের সেবাযত্নের ত্রুটি ঘটে। বিবাহের বাইরে যে প্রেম তার নিন্দা সকলের মুখে। কেননা তার দরুন সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মায়। সামাজিক প্রেম গুরুজনের মনঃপূত না হলেও তাকে দুর্নীতি বলার সাহস নেই কারো। কিন্তু অসামাজিক প্রেমকে দুর্নীতি বলতে সাহসের অভাব হয় না। তাই ওটা দুর্নীতি। সকলেই যখন একমত তখন দুটিমাত্র মানুষের প্রতিবাদে কী আসে যায়!

বিনুর মনটা সমাজের বিরুদ্ধে রুখে রয়েছিল তখনকার দিনে। যে সমাজ নারীকে সতী আখ্যা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে একশো বছর আগে তার নীতিবোধের উপর বিনুর ভরসা ছিল না। ইংরেজরা চলে গেলে সতীদাহ প্রথার পুনঃপ্রবর্তন হবে না, কে এ কথা জোর করে বলতে পারে! ইংরেজরা বহুবিবাহ করে না বলে ইংরেজী শিক্ষিতরাও করছে না। কিন্তু সামান্য একটু ছুতো পেলেই আর একটা বিয়ে করতে বাধে না। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না দেখে খবরের কাগজে বহুবিবাহের জন্যে হাহুতাশও ছাপা হয়।

তারপর এক এক সমাজের এক এক রীতি। মুসলমান সমাজে তালাক চলে, তিব্বতে এক নারীর একাধিক স্বামী-গ্রহণ। বর্মায় বিবাহের বাঁধাবাঁধি নেই, মালাবারে ক্ষত্রিয় কন্যাদের নামমাত্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একই আসরে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। বিচিত্র সংসার! বিচিত্রতর সংস্কার।

এ সমস্ত দেখেশুনে বিন্নুর ধারণা দৃঢ় হয় যে, সমাজের বিচারে যা দুর্নীতি তা নিরপেক্ষ বিচারে সুনীতি হতে পারে। নিরপেক্ষ বিচারক সামাজিক মানদণ্ড নির্বিবাদে স্বীকার করে নেন না। তাঁর মানদণ্ড বৃহত্তর বিশ্বের মূলনীতির মানদণ্ড। মূলনীতিও বটে, স্থির নীতিও বটে। তার নড় চড় হয় না।

স্থির নীতি

স্থির নীতি বলে অস্থির জগতে কিছু আছে কি না বিন্নু দীর্ঘকাল অন্বেষণ করেছে। থাকবে না কেন? চক্রের সবটাই কি অস্থির? যেটা তার কেন্দ্র সেটা কি ঘোরে! গতি যেমন সত্য স্থিতিও তেমনি। তা যদি না হতো গতি কোন দিন ফুরিয়ে যেত।

বিন্নু জড়বাদী বা বস্তুবাদী নয়, যদিও প্রচলিত অধ্যাত্মবাদেও তার অভক্তি। সে বিশ্বাস করে যে ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক শক্তিও এ জগতে কাজ করছে, যদিও তাদের কেউ দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে পায় না, যদিও তাদের কোনো ওজন বা পরিমাণ নেই। তাদের অস্তিত্ব অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায় না, তবু তারা আছে ও আমাদের জীবনে আলো আঁধারের ছক কাটছে।

একজনের পক্ষ যা ভালো আর এক জনের পক্ষে তা ভালো নয়। এই যুক্তি দিয়ে স্থানকালপাত্রনিরপেক্ষ মঙ্গলকে উড়িয়ে দিতে বিন্নু পারে না। কিম্বা স্থানকালপাত্রনিরপেক্ষ ন্যায়কে। অথচ প্রমাণ করাও তার সাধ্যের অতীত। যার নীতিবোধ

জাগেনি সে কিছুতেই বুঝবে না। যার নীতিবোধের চেয়ে স্বার্থবোধ প্রবল সে বুঝেও বুঝবে না। তা বলে কবিরা যদি সন্দিহান হন তবে গ্রীক ট্র্যাজেডি নিরর্থক, রামায়ণ মহাভারত তাৎপর্যহীন। বিনু অবশ্য ইঙ্গিত করছে না যে, ন্যায়ের জয় বা মন্দের ক্ষয় প্রতিপাদন করতে হবে। প্রতিপাদন করা কবিদের কর্ম নয়, কিন্তু জগতে যেমন প্রকৃতির লীলা চলেছে তেমনি নিয়তির খেলা চলেছে, কবিরা তার সাক্ষী। এত বড় একটা দৃশ্য যাঁর চোখে পড়েনি তিনি মহাকবি হবার অযোগ্য।

সত্য অসত্য, প্রেম অপ্রেম—এরাও নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক-শক্তি। এদের ঘাত-প্রতিঘাত যে-কোনো ডিটেকটিভ নভেলকে হার মানায়, যদি লিপিবদ্ধ হয়। কোনো নাট্যকার কি এদের উপেক্ষা করতে পারেন? কিন্তু প্রচারকের মনোবৃত্তি নিয়ে নাটক বা নভেল লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই করেই তো লোকের বিশ্বাস নাশ করা হয়েছে। এখন হয়েছে উলটো ফ্যাসাদ। লোকের বিশ্বাস হয় না বলে কবিদের চোখে পড়ে না। যাঁদের পড়ে তাঁদেরও তটস্থ ভাব, পাছে কেউ বলে প্রচারক। তার চেয়েও বড় গালাগাল আদর্শবাদী।

আধ্যাত্মিকতা

বিনু যখন নীতিনিপুণদের খোঁচায় তখন নীতি জিনিসটাকে উড়িয়ে দেয় না। নীতি বলতে বিনু বোঝে উচ্চতর নীতি, দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ। আর তাঁরা বোঝেন দেশাচার, কালাচার, সমাজরক্ষকদের মতে যেটা শিষ্টাচার। যে দেশে যাই

সে ফল খাই, এ যদি একটা নীতি হয় তবে মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ নিশ্চয়ই একজোড়া নীতি। রাজনীতি যদি নীতি হয় তবে সমাজনীতি কী দোষ করল ? রণনীতি যদি নীতি হয়, শস্ত্রনীতি যদি নীতি হয়, তবে শাস্ত্রনীতিও তাই।

কিন্তু উচ্চতর নীতির মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আছে, সেটা বিন্নুকে ব্যাকুল করে। ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সত্য অসত্য, প্রেম অপ্রেম, আলো ছায়া। কেন এ দ্বৈত ? এর উত্তর, এই রকমই হয়ে থাকে। 'ইহাই নিয়ম।' কার নিয়ম ? কে তিনি ?

তিনি বা তৎ, সগুণ ভগবান বা নির্গুণ ব্রহ্ম, দুই নন। এক। সেই এক আমাকে নিয়েই এক, আমার থেকে আলাদা হয়ে নয়। সেই একের মধ্যে সব আছে। সবই এক। একই সব। এ দুটি শব্দ সমার্থক। যখনি বলি, এক, তখনি বুঝি, সব। সবাইয়ের থেকে আলাদা হয়ে এক নয়।

সেই এককে যদি হিসাবের মধ্যে আনি তবে এই বিশ্ব-রহস্যের অর্থ এক নিমেষে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তাঁকে যদি বাদ দিই তবে এ ধাঁধার জবাব খুঁজে পাইনে। এর জবাব না পেয়ে শান্তি নেই। বিন্নুকে মহা অশান্তির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। সাংসারিক অশান্তি নয়। আধ্যাত্মিক অশান্তি। যাকে বলে স্পিরিচুয়াল আনরেস্ট। সমস্তক্ষণ ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। আত্মা আছে কি না, থাকলেও অমর কি না, অমৃতের অধিকারী কি না ? সার্থকতা যদি এক জীবনে না জোটে অন্য জীবনে কি জুটবে ? এ জীবনে যে কিছুই পেলো না তার অপ্রাপ্তিই কি চরম ? এমন কি হতে পারে যে

না পাওয়াটাই এক প্রকার পাওয়া, যাতে হৃদয় ভরে ? অপূর্ণতাই কি পূর্ণতা ?

এমনি কত কথা।

আদর্শবাদী

বাস্তববাদী হয়ে সুখ না থাক, সোয়াস্তি আছে। বাস্তব-বাদীকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। না পরের কাছে, না নিজের কাছে। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করো, কেন এত দুঃখ, কেন এত কু ? তিনি উত্তর করবেন, আমি কী করে বলব ? সুধাও তোমাদের ভগবানবাবুকে! আমি যেমনটি দেখেছি তেমনিটি দেখিয়েছি।

অনেকের ধারণা সাম্যবাদীরা বাস্তববাদী। কিন্তু তাঁরাও তলে তলে একপ্রকার আদর্শবাদী। তাঁরা যেমনটি দেখেন তেমনটি দেখিয়ে হাত গুটোন না। তাঁরা বলেন, এ যা দেখছ সব ক্যাপিটালিজমের কারসাজি। ক্যাপিটালিজম তুলে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে আদর্শবাদীদের জবাবদিহির দায় অত সহজে মেটে না। সব ঠিক হয়ে গেলেও সব জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। মানুষ তো কেবল সুখ সুবিধায় তৃপ্ত হবে না। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। ক্যাপিটালিস্টরা যখন অপসারিত হবে, সোশ্যালিস্টরা যখন নিষ্কণ্টক হবেন, তখন সেই আদর্শ সমাজে এমন প্রশ্ন এক দিন উঠবেই, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে—

কেউ কেউ বলেন 'আছে' কেউ কেউ বলেন 'নেই'—আমি তোমার কাছে এই বিষয় জানতে চাই, আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর। তখন নচিকেতাকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বাস্তববাদীরা তাকে হাঁকিয়ে দেবেন। আর লোকায়ত-বাদীরা তাকে লোভ দেখাবেন, শতবর্ষায়ু পুত্রপৌত্র প্রার্থনা করো, বহু পশু হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এবং বৃহদাকার ভূমি প্রার্থনা করো এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ করো। যদি অন্য কোনো বর এর সমতুল্য মনে করো, যথা, বিত্ত এবং চির জীবিকা, তাও প্রার্থনা করো। তুমি প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপর রাজা হও, তোমাকে সব কামনার কামভাগী করব। কিন্তু নচিকেতার সেই একই কাম্য। সে চায় তার প্রশ্নের উত্তর।

তখন ডাক পড়বে আদর্শবাদীদের। যাঁদের কাছে আছে ওর সম্পূর্ণ উত্তর। এ কি কখনো হতে পারে যে দু'শো কোটি মানুষের মেলায় এমন একজনও থাকবেন না যাঁর কাছে থাকবে উপযুক্ত উত্তর! সাহিত্যের তরফ থেকে ওরূপ জিজ্ঞাসার অন্তত আংশিক জবাব দিতে হবে বিন্নুকে।

দায়িত্ব

তখন থেকেই বিন্নু দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হচ্ছে। শুধু ওই একটি জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব নয়, জীবন সম্পর্কে যার মনে যে কৌতূহল জাগে সে কৌতূল নিরাকরণের। ধার্মিকের

বা দার্শনিকের মতো নয়, কবির বা সাহিত্যিকের মতো। উপনিষদ্ বা গীতা লিখে নয়, মহাভারত বা রামায়ণ লিখে। তা যদি না পারে তবে পদাবলী ও গীতিকা লিখে। তাও যদি না পারে তবে ছড়া ও বচন লিখে।

সেইজন্যে সে কারুর কোনো জিজ্ঞাসায় নিরুত্তর থাকে না। ঠিক হোক ভুল হোক যা হয় একটা জবাব দেয়, তার পর আরো ভাবে। তার মুখে মুখে জবাব শুনে এক বন্ধু তাকে পরিহাস করেছিলেন। বলেছিলেন, কবে এত মুখস্থ করলে? কোথায় পেলে এসব?

এত বড় দায়িত্ব যার সে যদি চুরি করে মুখস্থ করে থাকেই, তাতে কী! তাতে তার লজ্জা নেই। লজ্জা নিরুত্তরতায়। অথবা সীনিকের মতো ব্যঙ্গ বিদ্রূপে। যাও, সুধাওগে তোমাদের ভগবানবাবুকে।

মানুষের বিরুদ্ধে তার হাজার নালিশ, কিন্তু ভগবানের বিরুদ্ধে একটিও নয়। মাঝে মাঝে সে নাস্তিক হয়েছে, তার মনে হয়েছে ভগবান নেই। যিনি নেই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করার কথা ওঠে না। অরণ্যে রোদন করা, মানুষের কাছে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ানো, যেমন হাস্যকর তেমনি নিষ্ফল। ব্যঙ্গ বিদ্রূপও এক প্রকার রোদন।

তার চেয়ে মহিমা বেশি এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব নেওয়ায়। এ বিশ্ব যেমনই হোক আমি একে স্বীকার করলুম। আমিই আমার আপন হস্তে গ্রহণ করলুম এর ভার। এ যদি আমার মনের মতো না হয় কার কাছে অভিযোগ করব! না, আমার

কোনো অভিযোগ নেই বিধাতার বিরুদ্ধে। আমি যে দায়িত্ব-ভাগী। আমি যে সৃষ্টিকর।

বাপ তার কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে। বাপের চোখে সে তাই। এ বিশ্ব হাজার কুৎসিত হোক সৃষ্টিকরের চোখে সর্বাঙ্গসুন্দর। কালোর মধ্যেও সে আলোর দিশা পায়। মন্দের মধ্যে ভালোর।

সঙ্কট

এক দিকে অন্তহীন অনিশ্চয়তা, অন্য দিকে সীমাহীন প্রত্যয়। বিনু মন দিয়ে বুঝতে পারত না কী আছে, কী নেই। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করত সব আছে, এক আছেন। বুদ্ধি বলত, নেতি নেতি। স্বজ্ঞা বলত, ইতি ইতি। দর্শন বিজ্ঞান তাকে শেখাত ক্রিটিকাল হতে। কাব্য ও প্রেম শেখাত ক্রিয়েটিভ হতে। ক্ষুরধার পন্থা। কোনো এক দিকে একটু হেলান দিলেই অপঘাত। দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চলেছে, অথচ সংশয় মোচন হচ্ছে না। তখনকার দিনে অর্থাৎ তার বাইশ-তেইশ বছর বয়সে কেউ যদি তাকে দরদ দিয়ে চিনত তা হলে একই দেহে দেখত দু'জন মানুষকে। দু'জনেই বিনু। কিন্তু দু'জনের দুই মার্গ, দুই স্বভাব, দুই সাধনা।

এ দু'জনকে তফাৎ থেকে অনাসক্ত ভাবে দেখত আরো একজন বিনু। সে কোনো পক্ষে নয়। অপক্ষপাত। তার দেখার ধরন বৈজ্ঞানিকের মতো বিষয়মুখ বা অবজেকটিভ। অথচ যাদের দেখছে তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পৃথক নয়।

তাই তার দেখাটা প্রকৃতপক্ষে আত্মমুখ বা সাবজেকটিভ। সে তার আপনাকেই দেখত নাটকের বা উপন্যাসের দুটি চরিত্র রূপে। চরিত্রে দুটি সে নিজেই। কিন্তু তাদের উপর তার কোনো হাত নেই। সে শুধু সাক্ষী। এবং লিপিকর। লিপিকরপ্রমাদ যদি ঘটে তো তার অজ্ঞাতসারে। ঘটা বিচিত্র নয়, কারণ চরিত্র এবং চরিতকার একই ব্যক্তি।

এমনি করে বিনু কবি থেকে ঔপন্যাসিক হয়। কিন্তু তখনকার দিনে জানত না যে ঔপন্যাসিক হওয়া অনিবার্য। উপন্যাস লেখার সাধ অবশ্য ছিল মনের এক কোণে। সেটা যেন আকাশে ওড়ার সাধ। এরোপ্লেনে চড়ার। সমুদ্রযাত্রার অনিবার্যতা ছিল না তাতে। ছিল কাব্যরচনায়। কী করে যে কী হলো, পরবর্তী জীবনে ঔপন্যাসিক এগিয়ে গেল সামনে, কবি পড়ে রইল পিছনে। তেইশ বছর বয়সে এ রকম কোনো কথা ছিল না। কিন্তু অলক্ষ্যে এর জন্যে প্রস্তুত হওয়া চলছিল। প্রস্তুতির সময় বোঝবার উপায় নেই কিসের প্রস্তুতি ও কেন। বিনুর জীবনে এমন অনেক বার ঘটেছে। সে কখন কী ভাবে প্রস্তুত হয়েছে তা টের পায়নি, পরে তার প্রস্তুতির মর্ম অবগত হয়েছে।

তখনকার দিনে তার আভ্যন্তরিক সঙ্কট তাকে দারুণ কষ্ট দিয়েছে। এত কষ্ট যে ক্ষুধা তৃষ্ণাও মানুষকে তত কস্ট দেয় না।

কথক

ঔপন্যাসিক শব্দটা বিদ্‌ঘুটে। তার চেয়ে কথক ভালো। বিনু যা হয়েছে তার নাম কথক। কবির সঙ্গে তার তলে তলে যোগ রয়েছে। যেমন নদীর সঙ্গে হ্রদের। সেকালে গদ্য ছিল না, পদ্য ছিল কবি ও কথক উভয়েরই বাহন। বাল্মীকি যেদিন নিষাদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেদিন ছিলেন কবি, যেদিন রাম সীতা রাবণের তিন কোণা কাহিনী লিখলেন, সেদিন হলেন কথক। কিন্তু পদ্যে লিখলেন আর কবিপ্রসিদ্ধি অর্জন করার পর লিখলেন। তাই কথক বলে চিহ্নিত হলেন না। কবি বলেই অমর হলেন।

কিন্তু ব্যাসদেবকে কবি না বলে কথক বললে অসঙ্গত হয় না, কারণ তিনি গদ্যের অনুপস্থিতিতে পদ্য দিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন, গদ্যের চল থাকলে পদ্যের শরণ নিতেন না। একালের কথকরা সেকালে জন্মালে এক একজন কবি বলে গণ্য হতেন। কালক্রমে গদ্যের প্রবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে বলে তারা এখন কথক বলে পরিচিত। গদ্যের দ্বারা যে কাজ সহজে হয় সেই কাজ যদি কোনো কথক পদ্যের দ্বারা করাতে যান তবে যে তিনি সত্যি সত্যি কবি হবেন তা নয়। ওটা তাঁর ভ্রান্তি।

কাব্য প্রধানত আত্মমুখ। নাটক উপন্যাস বিষয়মুখ। একই ব্যক্তি এক বয়সে আত্মমুখ ও অপর বয়সে বিষয়মুখ হতে পারেন, হয়ে থাকেন। কেউ কেউ একই বয়সে দ্বিমুখ। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে নাটক উপন্যাসের প্রভেদ সেকালে যেমন

ছিল একালেও তেমনি। কাহিনীকে পদ্যের রীতি মানালেই তা কবিতা হয়ে যায় না। কবিতাকে গদ্যের রীতি ধরালেও তা কবিত্বহীন হয় না। তবে গাছের সঙ্গে পাখীর যেমন সহজ সম্পর্ক খাঁচার সঙ্গে তেমন নয়। সেইজন্যে পদ্যে কবিতা লেখার রীতি আবহমান কাল চলে আসছে ও চলতে থাকবে। কদাচিৎ এক আধজন কবি খাঁচায় পাখী পোষার মতো গদ্যে কবিতা লিখবেন। আর নাটক উপন্যাস এত কাল পরে তাদের উপযুক্ত আশ্রয় পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর গাছে গাছে বিচরণের পর মানুষ বেঁধেছে তার কুঁড়ে ঘর। এর পরে কেউ যদি গাছের ডালে শোয় তো শখ করে। পদ্যে নাটক বা গল্প লেখা একটা শখ।

অনিবার্য্যতা

বিনুর প্রাণে শখ নেই তা নয়। সে শৌখিন লোক। কিন্তু লেখা জিনিসটার পিছনে অনিবার্যতা থাকলে যেমন হয় শখ থাকলে তেমন নয়। যা অনিবার্য তাকে সাহায্য করছে সমস্ত প্রকৃতি, প্রকৃতির সমস্ত শক্তি। যে শক্তি ক্রিয়া করছে বিশ্বসৃষ্টির মূলে সেই শক্তিই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে। মানুষের ভিতর দিয়ে ক্রিয়া করছে বলে মানুষ তাকে নিজের শক্তি ভেবে আত্মপ্রসাদ পায়। কিন্তু সে শক্তি যদি কোনো কারণে অসহযোগ করে মানুষের প্রাণে হাজার শখ জাগলেও লেখা তেমন জোরালো হয় না, হতে পারে না।

কিন্তু অনিবার্যতার অর্থ সম্পাদকের তাগিদ কিম্বা অভাবের

তাড়না নয়। বিনু তার দয়িতাকে চিঠি লিখত. প্রেমের দায়ে। পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি লেখে প্রবন্ধ বা কাহিনী আকারে, প্রীতির দায়ে। কোনো দিন তাঁদের চোখে দেখবে না। তাঁদের কেউ ভারতবর্ষে, কেউ রাশিয়ায়। কেউ বিংশ শতকে, কেউ দ্বাবিংশ শতকে। তবু তার প্রীতির দায় সত্য। সেই অনিবার্যতা তাকে শক্তি জোগায়। সব সময় নয়. কেননা তার অনেক লেখা প্রীতির দায়ে নয়, মত জাহির করার ঝোঁকে। কতক লেখা নামের নেশায়। কিছু লেখা নূতনত্বের মোহে, আধুনিকতার কুহকে। বাকি লেখা শখের খাতিরে, খেয়ালের বশে।

সাহিত্যের ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে, শখের লেখা বা খেয়ালের লেখা অমর হয়েছে, অনিবার্য লেখা দাগ রেখে যায়নি। কাজেই এ বিষয়ে গোঁড়ামি ভালো নয়। কোনো বিষয়েই নয়। কে জানে কী টিকবে, কী টিকবে না! মহাকালের মনে কী আছে। রচনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হওয়াই বিজ্ঞতা। যেমন সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তা বলে উদাসীন হওয়া অনুচিত। সংকল্প করতে হবে, সাধনা করতে হবে, প্রীতির দেনা শোধ করতে হবে। তা যদি কেউ করে তবে প্রকৃতি সাহায্য করবে, বিধাতা করবেন। কাজটা তো তাঁদেরই। মানুষের সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টিরই অঙ্গ।

বিনু সাধারণত অনিবার্য না হলে লেখে না। বাঁচবে কখন যদি দিন রাত লেখে! কিন্তু প্রেরণা পেলে দিন রাত না লিখে শান্তি নেই। মুক্তি নেই।

পুরস্কার

এর কি কোনো পুরস্কার আছে? একজন যুবক তার যৌবন ক্ষয় করছে ভালোমন্দ লিখে। যৌবন কি আর ফিরবে? যৌবনের কি কোনো ক্ষতিপূরণ সম্ভব? ধন মান যশ কি তার বিনিময়? অমরত্ব?

না, তাও নয়। দেবতাদের অমরত্বের সঙ্গে অজরত্ব ছিল, না থাকলে নিছক অমরত্ব তাঁদের বিস্বাদ লাগত। বিনু কি শুধু অমরত্ব চেয়েছে? সে চেয়েছে অমৃত যা পান করে দেবতারা অজর তথা অমর। কে তাকে তেমন কোনো পুরস্কার দেবে?

প্রেমের প্রতিদানে প্রেম? প্রীতির প্রতিদানে প্রীতি? না, তেমন পুরস্কার সে প্রত্যাশা করতে পারে না। সে যা দিচ্ছে তা দায়ে পড়ে। কেউ যদি তারই মতো দায়ে পড়ে দিতেন সে নিত, নিয়ে কৃতার্থ হতো। কিন্তু অত বড় পুরস্কার প্রত্যাশা করা যায় না। ও তো পুরস্কার নয়, সৌভাগ্য।

বিনু বলে, এই যে আমি আপনাকে পাচ্ছি এই আমার পুরস্কার। আমার পুরস্কার আত্ম আবিষ্কার। এর জন্যে একটা দিনও অপেক্ষা করতে হয় না। একটা যুগ তো দূরের কথা। যে মুহূর্তে লিখি সেই মুহূর্তে পাই। হাতে হাতে লাভ। নগদ বিদায়।

এই আমার যৌবনের ক্ষতিপূরণ। এও সেই যৌবন। বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য যৌবনের প্রবাহ আসে এই উৎস হতে।

তিনিও আপনাকে অনবরত দিচ্ছেন, অনবরত পাচ্ছেন, পেয়ালা তাঁর উপুড় হয়েই ভরে উঠছে। শূন্য হলেই পূর্ণ হয়। যার উড়িয়ে দেবার সাহস আছে তার ফুরিয়ে যাবার শঙ্কা নেই। যে ধরে রাখে সেই হারায়।

বিন্নু বলে, আমি যেন একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেখান থেকে সোনা এনে দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছি। যত দিচ্ছি তত পাচ্ছি। যেদিন দিইনে সেদিন পাইনে। সঞ্চয় করলেই বঞ্চিত হই। যে দিন ভাবি, আমি দেদার দিয়েছি, আমার দানের ইয়ত্তা নেই, সেদিন আমার বয়স বেড়ে যায়। ভাঁড়ারে সোনা বাড়ন্ত। যেদিন ভাঁড়ার খালি করে বিলিয়ে দিই সেদিন দেখি আপনি ভরে উঠেছে। আমার তারুণ্য ফিরে এসেছে।

"আপনাকে এই পাওয়া আমার ফুরাবে না।" জীবনেও না, মরণেও না। এই অন্তহীন পূর্ণতার নাম অমৃত। বিন্নু বলে, এই আমার পুরস্কার।

ভাঙন

ওদিকে বিন্নুর প্রেমে ভাঙন ধরেছিল। যা সে কল্পনা করতেও অক্ষম ছিল তাই বাস্তবিক ঘটল। প্রেম তার নিজের নিয়মে আসে, নিজের নিয়মে যায়। কাউকে দোষ দিয়ে কী হবে ? দোষ যদি দিতে হয় তবে নিয়তিকে।

এই অঘটনের জন্যে বিন্নু কিম্বা তার প্রিয়া প্রস্তুত ছিলেন না। দু'জনেরই স্বপ্নভঙ্গ হলো। এটা অবশ্য নির্ঝরের

স্বপ্নভঙ্গ নয়। কাব্য লেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না। চিঠিতে রইল না চিঠি লেখার আনন্দ। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দায়েরও বিদায়। অনিবার্যতা অন্তর্হিত হলো।

যে মানুষ তিন বছর ধরে অবিরাম লিখে আসছে সে কি চুপ করে বসে থাকতে পারে! সে তার শূন্যতা ভরিয়ে নেয় পূর্ণতা দিয়ে। অন্তরের পূর্ণতা।

বিনু দেখল তার অন্তর পূর্ণ। আনন্দে না হোক অনির্বচনীয় বিষাদে। তার প্রেম তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। আর কিছু করবার নেই। এখন তার ছুটি। সে লিখবে। চিঠি নয়, কবিতা। প্রবন্ধ। কথা।

কিছু দিন পরে সে ইউরোপে যাবার ছাড়পত্র পেলো। আর এক দফা মুক্তি। এত কাল পরে তার বহুবাঞ্ছিত বিদেশযাত্রা। ছ'বছর সবুর করার পর মেওয়া ফলল। আশা ছিল না যে ফলবে। এক স্বপ্ন ভেঙে গেল, আর এক স্বপ্ন জোড়া লাগল। নিয়তি তাকে এক চোখে কাঁদাল, আর এক চোখে হাসাল। বিষাদের মেঘ, আনন্দের রৌদ্র। তার লেখনী দিয়ে সে ব্যক্ত করবে দুই। লিখবে কবিতা, প্রবন্ধ, কথা। লিখবে ভ্রমণকাহিনী। লিখবে সকলের তরে। প্রীতিভরে।

এমনি করে বিনু তার নিজেকে পেলো। আবিষ্কার করল আপনাকে। তার অন্তর পূর্ণ। তার কিছুরই অভাব হলো না। ভাষার, ছন্দের, বিষয়ের, কল্পনার, অনুভূতির। কে জানে কোথায় ছিল তার মোহিনী শক্তি বা চার্ম্। বোধ হয় প্রেমের

প্রয়োজনে এর উদ্‌ভব হয়েছিল সাগর-মন্থনে। রসের সাগর। এ শক্তি তার সাহিত্যের প্রয়োজনে লাগল।

যাত্রা

মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা আপনাকে পাওয়া। লেখকের জীবনে এর একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। লেখক আপনাকে পায় আপনাকে বিলিয়ে।

বিন্দুর মনে হলো, কোনো দিন কোনো অবস্থায় তার পূর্ণতার অভাব হবে না। দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে শ্মশানেও তার পূর্ণতা সমান অফুরন্ত। তখনো তার লেখা আপনি আসবে ভিতর থেকে। সে লিখবে কাব্য, নাটক, উপন্যাস। যে কোনো অবস্থায় পড়ুক সে তার অন্তরের খনি থেকে সোনা তুলে এনে ছড়াবে। সংসার তাকে জব্দ করতে পারবে না। তাকে স্তব্ধ করতে পারে এমন ক্ষমতা সম্পাদকের নেই, প্রকাশকের নেই, সমালোচকের নেই, সেন্‌সরের নেই, আর কারো নেই, আছে একমাত্র তার নিজের।

এমনি এক গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষমতাবোধ নিয়ে বিন্দুর যাত্রা শুরু। সমুদ্রযাত্রা তথা সাহিত্যযাত্রা।

এবার কলকাতা নয়, বম্বে। জাহাজ দাঁড়িয়েছিল তাকে অকূলে নিতে। দুরু দুরু করছিল বুক মায়ের কোল ছাড়তে। জননী জন্মভূমির দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর সজল হয় তার দৃষ্টি। যেদিকে তাকায় সেদিকে দেখতে পায় আরো

এক জোড়া চোখ, সজল কাজল। শেষ বিদায় তো নেওয়া হয়ে গেছে। তবে কেন মায়া!

জাহাজ যখন দুলল বিনুরও বুক দুলে উঠল। এত ক্ষণে চলল তার তরী, তার জীবনের তরী, তার সাহিত্যের তরী। চলল তার দেখা, চলল তার লেখা। ডেক থেকে ভিতরে গিয়ে সে চিঠির কাগজ নিয়ে বসল। এবার কিন্তু চিঠি নয়। ভ্রমণকাহিনী। কবিতা।

দেশে তখন সাত ভাই সাইমন এসেছেন বা আসছেন। কিন্তু বিনুর কাছে দেশ তখন ছায়া। বিদেশও তাই। মাঝখানে বিশাল সিন্ধু। বিষাদ সিন্ধুও বটে। তার যেন কোথাও কেউ নেই, সে সর্বহারা। জাহাজে যারা আছে তারা দু'দিনের সাথী। দু'দিন পরে কে কোথায় ছিটকে পড়বে, যার যেখানে কাজ। একমাত্র বিনুই চলতে থাকবে কালের তরীতে করে মহাকালের কূল থেকে অকূলে।

শেষ

শেষ নয়, অশেষ। তবু এখনকার মতো শেষ।

বিনু, তোমার কথা তো সারা হলো, এবার আমার কথা বলি। তোমার মনে রাখার জন্যেই বলা। তোমার মতো আরো অনেকের।

বিশ্ব তার আনন্দ বেদনা নিঃশব্দে বয়, তার মুখে ভাষা নেই। মানুষের মুখে ভাষা আছে বলে মানুষ বড় গোলযোগ করে। সে যদি মাঝে মাঝে নীরব হতো শ্রোতাদের প্রাণ

শীতল হতো। যাঁদের লেখনীর মুখে ভাষা আছে তাঁরাও যদি নীরব হতে জানতেন সাহিত্য আজ মেছোহাটা হয়ে উঠত না।

'যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা' তেমনি বলার অঙ্গ বলা ও না-বলা। যত বলতে হয় তত হাতে রাখতে হয়। নিঃশেষে বলার মতো ভুল আর নেই। তোমরা আধুনিক সাহিত্যিকরা বকতে জান, চুপ করতে জান না। এত উঁচু গলায় কথা কও যে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। তাতে তোমাদেরও গলা ফাটে, বিশ্বেরও তাল কাটে, শান্তিভঙ্গ হয়।

ভুলে যেয়ো না, চার দিকে অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। বিরাট জগৎ মহামুনির মতো মৌন। যদি কিছু জানাতে চায় তো ইশারায় জানায়। মানুষকে শব্দ দেওয়া হয়েছে শব্দ করবার জন্যে নয়। নিঃশব্দতাকে আরো নিঃশব্দ করবার জন্যে নয়। শব্দ দেওয়া হয়েছে নিঃশব্দতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবার জন্যে নয়, ছন্দ মেলাবার জন্যে। যেমন চলার ছন্দ পা ফেলা পা তোলা তেমনি বলার ছন্দ বলা ও না-বলা।

বিনু, তুমি কথা বলার আর্ট শিখেছ। না-বলার আর্ট শেখো।

(১৯৪৪)